For Standards III & IV in Schools in Western Bengal.

গদ্য ও পদ্য

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার

রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্—এলাহাবাদ

ও

ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্—২২।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

১৯২৬

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক :—

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ।

শ্রী

প্রিণ্টার :—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্

বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

সূচীপত্র

(প্রথমার্দ্ধ)

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ)

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

গদ্য ও পদ্য

প্রথমার্দ্ধ

বারাণসীর রাণী ।

একদা এক বালিকা বারাণসীতে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ তাহার এক গাছি কঙ্কণ হাত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং একটি কাক খাদ্য বস্তু মনে করিয়া তাহা লইয়া উড়িয়া গেল।

এমন সময়ে তাহার মাতা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা মাতার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আরও ভয় পাইল ; তাঁহাকে কঙ্কণের কথা বলিতে সাহস করিল না। মাতা বলিলেন, "সেদিন কুম্ভকার যে ঠকাইয়া আমাদিগের নিকট ছিদ্রযুক্ত কলস বিক্রয় করিয়াছে, তজ্জন্য চল আমরা রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে যাই।" বালিকা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া মাতার সহিত গৃহে ফিরিয়া গেল।

সে দিন রাজধানীতে মহা সমারোহ। রাজা মীনধ্বজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেইজন্য নগরবাসিগণ নানা আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। রাজবাড়ীতে মহাসভা হইয়াছে; সেখানে রাজা নিজ-হস্তে সৈন্যদিগকে পুরস্কার বিতরণ এবং দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিতেছেন।

সভার কার্য্য যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন রাজপুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজাকে বলিলেন, —"রাজন্, আপনার দিগ্বিজয় শেষ হইল; এখন আপনার বিবাহের সময় হইয়াছে। আপনাকে বিবাহ করিতে দেখিলে রাজ্যের সকলেই সুখী হইবে।"

পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া রাজা উত্তর করিলেন, —"আমি যুদ্ধে এত ব্যস্ত থাকি যে, কন্যা অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি ঈশ্বর সুশীলা কন্যা দান করেন, তবে অবশ্যই বিবাহ করিব।"

ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত কাক-পক্ষী রাজবাড়ীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। দৈবক্রমে বালিকার কঙ্কণটি তাহার চঞ্চু হইতে রাজার সম্মুখে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজা মনে করিলেন, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই যেন এই ঘটনা ঘটিল। তিনি বলিলেন, "যে কুমারী এই কঙ্কণ হারাইয়াছে, তাহাকেই বিবাহ করিব।"

এই সময়ে সেই বালিকা ও তাহার দরিদ্রা মাতা বহুকষ্টে রাজদরবারে প্রবেশ করিল। কুম্ভকার ছিদ্রযুক্ত কলস বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহারা রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে আসিয়াছিল। রাজার হস্তে নিজের কঙ্কণটি দেখিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া বলিল,—"মা, ঐ দেখ আমার কঙ্কণ। ইহা কাকে ঠোঁটে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।" এই বলিয়া কঙ্কণটি রাজার নিকট হইতে লইয়া সে অনায়াসে নিজের হাতে পরিল। ইহা দেখিয়া সভার সকল লোক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

রাজা বলিলেন,—"বারাণসীর রাজার বাক্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না; এই কুমারীই রাজ্যের রাণী হইবে।"

এইরূপে সেই দরিদ্রা বালিকা বারাণসীর রাণী হইয়াছিল। কথিত আছে, রাণী হইয়া সে দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য এত যত্ন করিত যে, রাজ্যের সকল লোক তাহাকে মায়ের অধিক ভক্তি করিত।

প্রশ্ন।

১। এই গল্পটি নিজের ভাষায় বল।

২। সমারোহ, দিগ্বিজয়, কঙ্কণ, দৈবক্রম, দুঃখবিমোচন ও ভক্তি—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৩। কুম্ভকার, নদীতীর, অন্নবস্ত্র ও মীনধ্বজ—এইগুলির সমাস-বাক্য বল।

৪। ঠকাইয়া, তাড়াতাড়ি, ঠোঁট—এই তিনটি চলিত শব্দ সাধুভাষায় কি হইবে ?

৫। "যাহা বলা উচিত নয়", "যাহা অতি কষ্টে লাভ করা যায়", "পান করিবার ইচ্ছা", "যাহার জ্ঞান আছে", "যে অনেক কথা বলে না", "যাহা জলে জন্মে", "যাহা চিন্তা করা যায় না"—এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটির অর্থ এক একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ কর।

৬। দ্বারা—দারা, দিন—দীন, কমল—কোমল, অন্ন—অন্য, পদ্য—পদ্ম, ধনী—ধ্বনি,—এই সকল শব্দযুগ্মের অর্থগত পার্থক্য কি ?

৭। "উত্তর" এই শব্দটির যতগুলি অর্থ তোমার জানা আছে বল।

পিতৃভক্তি।

আরব দেশের মুসলমান নরপতি খলিফা মুয়াবিয়ার নানা সদ্‌গুণ ছিল। আজও তাঁহার সুনাম লোকের মুখে শুনা যায়।

আলি নামে এক দুষ্ট ব্যক্তি এই খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল। আলির কন্যা আর্জানা স্ত্রীলোক হইয়াও পিতার পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

আলির সহিত খলিফার সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ হইল এবং সেই যুদ্ধে আলির পক্ষের লোকদিগের পরাজয় হইল।

আলির কন্যা আর্জানা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই ভয়ানক যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, এবং পিতার পক্ষের লোকদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছিলেন। যুদ্ধে পরাজয় হইলে রাজপক্ষের লোকেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

যুদ্ধের অবসানে একদা খলিফা দরবারে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেনাপতি নিবেদন করিলেন,—"আলির কন্যা আর্জানাকে আমরা বিচারের জন্য সভায় আনিয়াছি। সে যুদ্ধকালে বিদ্রোহীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল। আদেশ হইলে তাহার প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা করা যায়।"

খলিফা বলিলেন,—"তাহাকে সভায় উপস্থিত কর।" যথাসময়ে আর্জানা সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। খলিফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন কি?"

আর্জানা উত্তর দিলেন,—"হাঁ, আমি পিতা আলির পক্ষ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। পিতা পরম দেবতা।"

খলিফা আবার প্রশ্ন করিলেন,—"তাহা হইলে সে দিন যুদ্ধে যে এত লোকের মৃত্যু হইল, তাহার জন্য আপনি দোষী কি না?"

আর্জানা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন,—"হাঁ, পিতা আলির দোষ থাকিলে আমিও দোষী।"

খলিফা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উজীরকে বলিলেন,—"প্রাণদণ্ড ইহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আবশ্যক। ইঁহাকে ছাড়িয়া দেও এবং প্রচুর ধন-দৌলত দাস-দাসী দিয়া সসম্মানে ইঁহার নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেও। ইনি যথার্থ পিতৃভক্তা কন্যা। ইঁহার দৃষ্টান্তে রাজ্যের সকল লোকই সুশিক্ষা লাভ করিবে।"

প্রশ্ন।

১। এই পাঠে পিতৃভক্তির কি উদাহরণ পাইলে নিজের ভাষায় বল।

২। খলিফা আর্জানাকে ক্ষমা করিলেন কেন?

৩। সুনাম, বিদ্রোহী, তুমুল, উত্তেজনা, প্রাণদণ্ড,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৪। গুরু, গুরুতর, গুরুতম,—এই তিনটি শব্দের অর্থ কি? এই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া নিজে তিনটি বাক্য রচনা কর।

৫। "পিতৃ" এই শব্দের সহিত অন্য পাঁচটি শব্দ যোগ করিয়া পাঁচটি যৌগিক শব্দ রচনা কর।

৬। উজীর, দৌলত, খলিফা,—এগুলির অর্থ কি?

৭। "পিতার পক্ষ", "কূলের সমীপে", "কর্ম্মে কুশল", "হিমালয় নামক গিরি", "শুভ্র অম্বর যাহার",—এইগুলির প্রত্যেকটি এক একটি শব্দ রচনা করিয়া ব্যক্ত কর।

৮। বর্ষ, ব্যবহার, দন্ত,—এই বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত কর।

ক্ষমা।

তোমরা নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেবের নাম অবশ্যই শুনিয়াছ। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত এবং ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করেন।

চৈতন্যদেব সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেন। ঐরূপে তিনি অনেক অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথে আনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ নামে এক মহাত্মা চৈতন্যের সহচর ছিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই নামে দুইজন মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহারা মুসলমান রাজার অধীনে গ্রামে শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু শান্তিরক্ষা দূরে থাকুক, তাহারা সর্ব্বদা মদ খাইয়া ও লোকের উপর অত্যাচার করিয়া গ্রামে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি করিত।

একদা জগাই ও মাধাইয়ের গৃহের সম্মুখ দিয়া চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। ঐসময়ে জগাই ও মাধাই উভয়েই মদ্যপান করিতেছিল। ঈশ্বরের নাম তাহাদের ভাল লাগিল না ; তাহারা টলিতে টলিতে পথে আসিয়া কীর্ত্তনকারীদিগকে আক্রমণ করিল, হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহাই তাহাদিগকে ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। এইরূপে একটা ভাঙ্গা কলসের অংশ নিত্যানন্দের কপালে লাগায় তিনি ভয়ানক আঘাত পাইলেন। তাঁহার ললাট হইতে তীরবেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। ইহাতে চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যেরা সকলে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, নিত্যানন্দ বলিলেন, "বন্ধুগণ! ক্ষান্ত হও। ভাই জগাই, ভাই মাধাই! আমাকে তোমরা মারিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তবু ঈশ্বরের নাম লও। পাপে চিরকাল ডুবিয়া থাকিও না।"

নিত্যানন্দের ক্ষমা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। জগাই মাধাইও বিস্মিত হইল এবং সেই দিন হইতে মদ্যপান ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

ক্ষমা মহাপুরুষের লক্ষণ ; যিনি অপকারীকে কেবল ক্ষমা না করিয়া নিত্যানন্দের ন্যায় প্রেম বিতরণ করিতে পারেন, তিনি দেবতা।

প্রশ্ন।

১। "ক্ষমা" কাহাকে বলে? ইহা ভাল গুণ, না মন্দ গুণ? আরও তিনটি ভাল গুণের নাম বল।

২। নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইকে কি-প্রকারে ক্ষমা করিলেন, সহজ ভাষায় বল।

৩। কীর্ত্তন, বৈষ্ণব, শান্তিরক্ষা, অত্যাচার, দণ্ড, প্রেম,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৪। অত্যাচার, নিত্যানন্দ,—এই দুইটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

৫। প্রতি+উপকার, জগৎ+বন্ধু, জগৎ+মাতা,—এই গুলির সন্ধি কর এবং সন্ধির সূত্র বল।

৬। "গৃহ" এই শব্দটিকে যত রকমে তুমি বহুবচন করিতে পার, করিয়া দেখাও।

৭। শূদ্র, পুরুষ, কর্ত্তা, দাতা, ধনী,—এইগুলি স্ত্রী-লিঙ্গে কি হইবে?

বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগ

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তিনি যে কেবল বিদ্যা ও জ্ঞানের সাগর ছিলেন, তাহা নয়, দয়া প্রভৃতি নানা গুণের জন্যও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সামান্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করার সংকল্প করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখন অর্থের অভাব ছিল। উচ্চ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে অর্থাভাব দূর হইবে মনে করিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিযুক্ত করা স্থির হইয়া গেল, তখন একদিন তিনি কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত দেখা করিলেন এবং নানা কথার পর তাঁহাকে বলিলেন,—"আমাকে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবেন না। আমার বন্ধু তারানাথ তর্কবাচস্পতি আমার তুলনায় ব্যাকরণে অধিক পণ্ডিত। অতএব তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করুন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বন্ধুর মঙ্গলের জন্য কেহ যে, এই প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, তাহা তিনি এই প্রথম দেখিলেন। অবশেষে বাচস্পতি মহাশয়ই অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর

মহাশয় ইহাতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি নিয়োগ-পত্র হাতে করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের গৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নূতন পদলাভের কথা জানাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কার্য্য দেখিয়া বাচস্পতির চক্ষে জল আসিল ; তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বিদ্যাসাগর, তুমি মানব নহ, তুমি দেবতা!"

প্রশ্ন।

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? তিনি কে ছিলেন? কি জন্য লোকে আজও তাঁহার কথা মনে রাখিয়াছে?

২। বিদ্যাসাগর, মহাত্মা, স্বার্থত্যাগ, তর্কবাচস্পতি, নিয়োগ-পত্র,—এইগুলির অর্থ বল এবং এগুলির সমাস বিচ্ছেদ করিয়া সমাস-বাক্য বল।

৩। বাচস্পতি বিদ্যাসাগরকে বলিলেন,—"বিদ্যাসাগর, তুমি মানব নহ, তুমি দেবতা।" কেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেবতা বলা হইল বুঝাইয়া বল।

৪। জগৎ+মাতা, নিঃ+রব, চক্ষুঃ+লজ্জা, বয়ঃ+কনিষ্ঠ,—এইগুলির সন্ধি কর এবং যে যে সূত্র অবলম্বনে সন্ধি করিলে সেগুলি বল।

৫। "তরুছায়াতে বসিয়া মনযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত।" এই বাক্যে সন্ধির কোন ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া বল।

৬। "আমাকে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবেন না।" এই বাক্যটির প্রত্যেক পদের পরিচয় দাও।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সদাশয়তা

সত্তর বৎসরেরও আগে লর্ড বেন্টিঙ্ক আমাদের দেশের লাট ছিলেন। তিনি কখনও কখনও ছদ্মবেশে বড় বড় আফিস আদালতে প্রবেশ করিয়া রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্য ও ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেন। যদি কোন কর্ম্মচারীর ব্যবহারে বা কার্য্যে দোষ ধরা পড়িত, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। বেন্টিঙ্ক মহোদয় তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মচারীর দোষের কথা প্রধান কর্ম্মচারীর গোচরে আনিতেন।

একদা দ্বিপ্রহরে দরিদ্র সৈনিকের মত ছেঁড়া পোষাক পরিয়া লর্ড বেন্টিঙ্ক কলিকাতার এক বড় আফিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে বৃদ্ধ ও অক্ষম সৈনিকগণ পেন্‌সনের টাকা পাইবার জন্য আসিত। কাজেই, দ্বারবান্‌ এবং কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহই ছদ্মবেশী বেন্টিঙ্ককে চিনিতে পারিল না।

যাহা হউক, তিনি আফিসে প্রবেশ করিয়াই বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। বড় সাহেব তখন তাঁহার ক্ষুদ্র কামরায় বসিয়া আফিসের কাজ করিতেছিলেন; কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে

লর্ড বেণ্টিঙ্ক।

বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিন্তু ছদ্মবেশী বেন্টিঙ্ক নিরস্ত হইলেন না; তিনি বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। এই ব্যবহারে কর্ম্মচারিগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং বেন্টিঙ্ককে আফিস হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য দ্বারবান্‌কে আদেশ দিল। বেন্টিঙ্ক বুঝিলেন, এই স্থানে আর থাকা চলিবে না,—পরিচ্ছদ মলিন ও ছিন্ন বলিয়া নির্ব্বোধ কর্ম্মচারী ও দ্বারবান্‌দিগের নিকটে তাঁহাকে শীঘ্রই অপমানিত হইতে হইবে। তাড়াতাড়ি একখণ্ড কাগজে নিজের নামটি লিখিয়া এবং তাহা দ্বারবানের হাতে দিয়া তিনি আফিস ত্যাগ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেই কাগজখানি বড় সাহেবের হস্তগত হইল। তিনি তাহাতে লর্ড বেন্টিঙ্কের স্বাক্ষর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সকলেই শুনিল, বড় লাট সাহেব দরিদ্র ইংরেজের বেশে আফিসে আসিয়া, সেখানকার কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। আফিসে সাহেব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি পথে বাহির হইয়া লাট সাহেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

কথিত আছে, এই ঘটনার পরে একদা লর্ড বেন্টিঙ্ক আফিসের কর্ত্তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং

যাহাতে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ আগন্তুকদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহার ব্যবস্থার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন।

১। এই পাঠে লর্ড বেণ্টিঙ্কের কি সদাশয়তার পরিচয় পাইলে, নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বল।

২। স্বাক্ষর, আগন্তুক, সদ্ব্যবহার, ছদ্মবেশ, নিরস্ত, বিরক্ত,—এই কয়েকটি শব্দের অর্থ বল।

৩। "কৃ" ধাতুর সহিত অপ, অধি, উপ, প্র এবং বি এই উপসর্গগুলি যোগ করিয়া এক একটি শব্দ রচনা কর এবং তাহাদের প্রত্যেকটির অর্থ বল।

৪। চন্দ্রমুখ, শিব, পতি, ব্রহ্মা, নায়ক, হরিণ, ব্যাঘ্র,—এই শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গে কি হইবে?

৫। "অভিপ্রায়" এই কথাটির সমানার্থবোধক তিনটি শব্দ বল।

৬। ক্ষুদ্র, ব্যবহার, দরিদ্র, দোষ, মলিন, ছিন্ন,—এই শব্দগুলির মধ্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত কর।

দয়া।

কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি বৃহৎ নগরের রাজপথগুলির এক একটা বিশেষ নাম আছে। অনেক সময়ে এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে এক একটি পথের নামকরণ হয়। তোমরা কলিকাতার হ্যারিসন্ রোডের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। সার্ হেনরি হ্যারিসন্-নামক একজন ইংরেজ মহাত্মার নামে এই সুপ্রশস্ত রাজপথের নামকরণ হইয়াছে। এই পাঠে তোমাদিগকে হ্যারিসন্ সাহেবের দয়াশীলতার দুইটি উদাহরণ দিব। হ্যারিসন্ সাহেব সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং নানা স্থানে প্রশংসার সহিত জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া শেষে কলিকাতা মিউ-নিসিপালিটির সভাপতি হয়েন।

(১)

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের উপরে অনেক কার্য্যের ভার থাকে। জেলার শান্তিরক্ষা, রাস্তাঘাট ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং রাজস্বসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। এইজন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা এক স্থানে বসিয়া কার্য্য করিতে পারেন না; তাঁহাদিগকে প্রায়ই গ্রামে এবং মহকুমায়

ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। হ্যারিসন্ সাহেব যখন মেদিনী-পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন তিনি অনেক সময়ে গাড়িতে বা কুলির মাথায় আবশ্যক দ্রব্য বোঝাই করিয়া গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইতেন। গাড়ির ভাড়া বা কুলির মজুরি প্রভৃতি সামান্য খরচের ভার চাপরাসীর উপরে থাকিত।

একদা হ্যারিসন্ সাহেব দৈনিক ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন, সেদিন গাড়ির ভাড়া এক টাকা স্থলে বার আনা হইয়াছে। চাপরাসীকে আহ্বান করা হইল এবং গাড়ির ভাড়া কেন অল্প দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। শেষে জানা গেল, অল্প খরচ দেখাইয়া সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই চাপরাসী গাড়োয়ানদিগকে অল্প ভাড়া দিয়াছে। হ্যারিসন্ সাহেব পরদিন প্রভাতে গাড়োয়ান্-দিগকে ডাকিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেন।

(২)

গ্রামপরিদর্শনে বাহির হইলে হ্যারিসন্ সাহেব প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় একাকী ভ্রমণ করিতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি কোন ক্ষুদ্র গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, হঠাৎ অদূরে এক কৃষকের গৃহ হইতে কতকগুলি বালকবালিকা ও স্ত্রীলোক হাহাকার-ধ্বনি

করিয়া মাঠের দিকে ছুটিতেছে। হ্যারিসন্ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কোন বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া তিনিও কৃষকের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগিলেন। একটু অগ্রসর হইলে বুঝা গেল, গৃহে আগুন লাগায় কৃষক-পরিবারের সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যাইতেছে। হ্যারিসন্ সাহেব তৎক্ষণাৎ জুতা ও জামা দূরে ফেলিয়া গৃহের ছাদে উঠিলেন এবং আগুনে জল দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা আগুন নিবাইতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

হ্যারিসন্ সাহেব যদি সেদিন ঐপ্রকার উদ্যোগী হইয়া গৃহদাহ নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত গ্রাম কয়েক মুহূর্ত্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। অদ্যাপি ঐ গ্রামের বৃদ্ধগণ কৃতজ্ঞতার সহিত হ্যারিসনের নাম স্মরণ করে।

দয়া মনুষ্যের পরম গুণ। হ্যারিসন্ দয়াবান্ ছিলেন বলিয়াই লোকে আজও তাঁহার নাম করে।

প্রশ্ন।

১। হ্যারিসন্ সাহেবের দয়া সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছ, তাহা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বল।

২। আগুন, ছাই, ভোর বেলা, দুপুর বেলা, মজুরি, গাড়োয়ান,—এই চলিত কথাগুলিকে ভাল কথায় রূপান্তরিত কর।

৩। রাম, দশরথ, বনগমন,—এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি বাক্য রচনা কর।

৪। বিশেষ্য কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের এক একটি উদাহরণ দাও। সাহস, মহিষ, কলিকাতা, হ্যারিসন্,—এগুলি কোন্ কোন্ বাচক বিশেষ্য?

৫। "নিরপরাধী ব্যক্তিকে কখনও রাজাগণ কুচরিত্রবান্ মনে করেন না।" এই বাক্যটিতে কোন ভুল থাকিলে সংশোধন কর।

৬। "পদগ্রহণ" এই শব্দটির অর্থ কি? "পদ" শব্দটির সহিত অন্য শব্দ যোগ করিয়া কয়েকটি যৌগিক শব্দ রচনা কর।

৭। অল্প, আবশ্যক, প্রশংসা, ন্যায্য, বৃদ্ধ, পুরস্কার, সামান্য, উন্নতি, দান,—এইগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দ বল।

হজ তীর্থ।

আরবদেশের মক্কানগরী মুসলমানদিগের পবিত্র তীর্থ। প্রতিবৎসরই ভারতবর্ষ ও অপর দেশ হইতে হাজার হাজার মুসলমান এই তীর্থ দেখিবার জন্য আরব-দেশে গমন করেন। মুসলমানগণ এই পুণ্য কার্য্যকে "হজ" বলেন। যাঁহারা "হজ" সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদিগকে "হাজি" উপাধি দেওয়া

হয়। ইহা অতিসম্মানসূচক উপাধি। আমাদের দেশে গ্রামে ও নগরে প্রায়ই তুই একজন হাজি দেখা যায়।

হিন্দুরা যেমন বৎসরের যে কোন শুভদিনে তীর্থযাত্রা করেন, মুসলমানদিগের হজযাত্রা সে প্রকারে হয় না। মুসলমান-বৎসরের শেষ মাসই যাত্রার উপযুক্ত সময়।

"মস্‌জেদ্ অল্ অহরাম্" নামে একটি বহু প্রাচীন উপাসনালয় মক্কার প্রধান দর্শনীয় স্থান। মুসলমানগণ বলেন, প্রথম মনুষ্য আদম এই স্থানে ঈশ্বরের দূতের নিকট হইতে উপাসনাপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে অতিপ্রাচীনকাল হইতে ইহা পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখন সেখানে কোন মস্‌জেদ্ ছিল না। হজরৎ মহম্মদের তুই পূর্ব্ব-পুরুষ ইব্রাহিম ও ইস্‌মাইল তথায় মস্‌জেদ্ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মস্‌জেদ্ বলিলে আমরা যেমন কারুকার্য্য-যুক্ত বড় ইমারত বুঝিয়া থাকি, ইহা তখন সেপ্রকারে নির্ম্মাণ করা হয় নাই। প্রথমে স্থানটিকে সামান্য প্রাচীরের দ্বারা ঘেরা হইয়াছিল। প্রাচীরের উপরে ছাদ দেওয়া হয় নাই। পরে তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই জন্য অনেকে এই মস্‌জেদ্‌কে "কাবা" (ঘন-ক্ষেত্র) বলিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকল দেশেরই মুসলমানগণ 'কাবা'র দিকে মুখ রাখিয়া প্রতিদিন উপাসনা করেন।

মক্কায় উপস্থিত হইয়াই তীর্থ-যাত্রিগণ 'কাবা'য় প্রবেশ করিতে পারেন না। মস্‌জেদ্ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে তাঁহাদিগকে ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান করিতে হয় এবং তাহার পরে শুভ্রবেশ পরিধান করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। এই প্রকারে শুচি হওয়ার পরে কেহই জুতা বা ছাতা ব্যবহার করেন না। তীর্থের কাজ শেষ হইলে তাঁহারা সেই বেশ পরিত্যাগ করিয়া ও মস্তকমুণ্ডন করিয়া সাধারণ বেশভূষা ধারণ করেন।

'কাবা'র প্রাচীরের গায়ে একখানি কৃষ্ণবর্ণের পাথর লাগান আছে। তাহা অতি পবিত্র বস্তু। তীর্থযাত্রীরা 'কাবা'র নিকটবর্ত্তী হইয়া উহা স্পর্শ করিয়া চুম্বন করেন এবং পরে সাতবার 'কাবা' প্রদক্ষিণ করেন। ইহা ছাড়া নিকটবর্ত্তী "সফা" ও "মর্‌বা" নামক পর্ব্বতশৃঙ্গে এবং "মীনা" উপত্যকায় যাত্রীদিগকে আরও অনেক অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাত্রীরা 'মীনা' উপত্যকায় রাত্রিযাপন করিয়া সাধ্যানুসারে উষ্ট্র, ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশু বলি দিয়া থাকেন। বলির মাংস যাত্রীরা গ্রহণ করেন না; দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়।

'কাবা'র পার্শ্বে "জম্‌জম্"-নামক প্রসিদ্ধ কূপ আছে। ইহার জল মুসলমানদিগের অতি পবিত্র সামগ্রী। যাত্রিগণ এই জল পান করেন এবং বাড়ী ফিরিবার সময় তাহা শিশি ও বোতলে করিয়া সঙ্গে আনিয়া থাকেন।
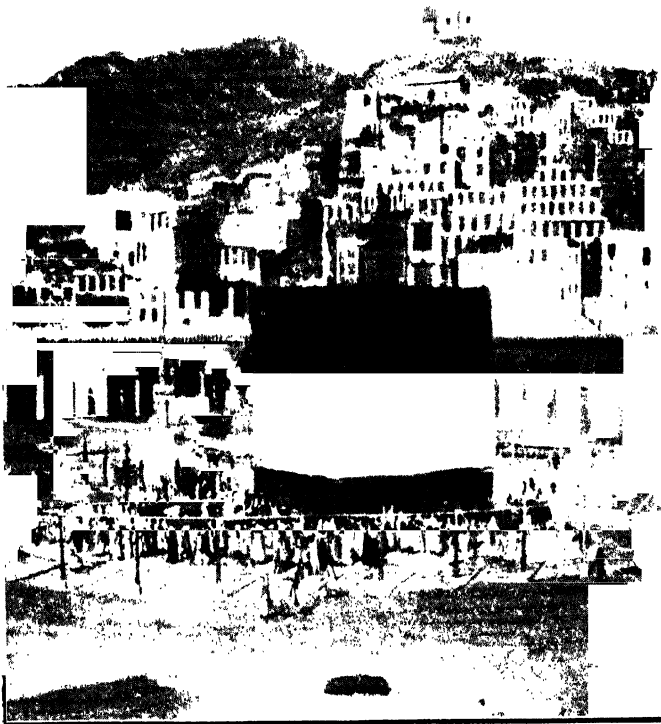
মক্কার কাবা

আরব-দেশের সুবিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে মক্কা-নগরী অবস্থিত। সেখানে খাদ্য ও পানীয় সহজে পাওয়া যায় না। সুতরাং দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের বিশেষ কষ্ট হয়; কিন্তু তথাপি সাধু মুসলমানগণ সেই তীর্থ দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করেন তাহার তুলনা হয় না। স্বয়ং হজরৎ মহম্মদও মৃত্যুর পূর্ব্বে 'কাবা'য় তীর্থ করিয়া, পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন

১। পবিত্র, উপাসনালয়, দর্শনীয়, পর্ব্বতশৃঙ্গ, ক্ষৌরকার্য্য, শুভ্রবেশ, শুচি, অনুষ্ঠান,—এই কথাগুলির অর্থ সরল ভাষায় বল।

২। "হাজি" কাহাদের বলা হয়? "কাবা" কাহাকে বলে?

৩। মক্কায় গিয়া মুসলমান তীর্থযাত্রীরা কি কি অনুষ্ঠান করেন, সরল ভাষায় বল।

৪। সম্মানসূচক, কারুকার্য্যযুক্ত, বেশভূষা, মরুভূমি,—এগুলিকে বিচ্ছেদ করিয়া সমাস-বাক্য লিখ।

৫। অকর্ম্মক, সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া কাহাকে বলে? এক একটি বাক্য রচনা করিয়া প্রত্যেকের উদাহরণ দাও।

৬। কুজন—কূজন; গিরিশ—গিরীশ; চূত—চ্যুত; দূত—দ্যুত; প্রসাদ—প্রাসাদ;—এই শব্দযুগ্মগুলির অর্থের পার্থক্য কি?

৭। "তীর্থ" এই শব্দটির অন্য যে-সকল অর্থ আছে, সেগুলি বল।

আদিকবি।

তোমরা মহামুনি বাল্মীকির নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। অতিপ্রাচীনকালে তিনি সংস্কৃতভাষায় পদ্যে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় যে রামায়ণ আছে, তাহার অনেক কথাই বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ হইতে লওয়া হইয়াছে। বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষার আদিকবি। যে ঘটনায় বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম কবিতা বাহির হয়, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক।

তোমরা বোধ হয় জান, মুনিরা নগরে বা গ্রামে বাস করিতেন না। যেখানে নগর বা গ্রামের কোলাহল প্রবেশ করিতে পারিত না, সেই প্রকার বনে তাঁহারা বাস করিতেন। বৃক্ষলতায় এবং ফলে ফুলে ঐ স্থানগুলি বড় সুন্দর দেখাইত। হয় ত একটি ছোট নদী বনের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত থাকিত। মুনিরা কুটীরে বাস করিতেন ও বনের ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা জগদীশ্বরের চিন্তা করিতেন। কাহারও হিংসা-দ্বেষ করিতেন না। বনের হরিণ এবং পক্ষিগণ তাঁহাদের কুটীরের চারিদিকে নির্ভয়ে বেড়াইত। প্রত্যেক মুনিরই অনেক শিষ্য থাকিত। তাহারা মুনিদিগের নিকটে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং ভৃত্যের ন্যায় গুরুর নানা

কার্য্য করিত। পিতা যেমন পুত্রকে স্নেহ করেন, মুনিরা শিষ্যগণকে সেই প্রকার স্নেহ করিতেন এবং শিষ্যেরাও তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে এইপ্রকার একটি তপোবনে বাস করিতেন। একদা সন্ধ্যার আগে নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তিনি দেখিলেন, গোধূলির আলোকে সমস্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। আকাশ, জল এবং নদীতীর সকলই যেন স্বর্বর্ণে মণ্ডিত। কেবল দূরের বনগুলি একটু সবুজ বলিয়া বোধ হইতেছে। মাথার উপর দিয়া এক দল পক্ষী কলরব করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত শাবকদিগকে খাবার দিবার জন্য বাসার দিকে তাড়াতাড়ি চলিতেছিল। নিকটেই নদীতীরে দুইটি বক খেলা করিতেছিল, তাহাদের কাকলী শুনিয়া বাল্মীকির মন প্রফুল্ল হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পক্ষী দুইটি কেমন সুখী, ইহাদের কোন শত্রু নাই; ইহাদের শোকতাপ নাই, দুঃখজ্বালা কিছুই নাই।

এমন সময়ে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ একটি গাছের আড়ালে থাকিয়া ঐ বক দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িল। ইহাতে একটি বক কিছুকাল যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া গেল এবং অপরটি ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাল্মীকির হৃদয় গলিয়া গেল,

তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি দুষ্ট ব্যাধকে বলিলেন,—"পাখী দুইটি আনন্দে খেলা করিতেছিল, তুই কেন তাহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলি? তোর কখনই মঙ্গল হইবে না।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ কথাগুলি বাল্মীকি সাধারণ কথার মত বলিলেন না; এক নূতন ছন্দে কবিতার ভাষায় বলিলেন। কিপ্রকারে তাঁহার মুখ হইতে এই নূতন কবিতা বাহির হইল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। এই প্রকারে সংস্কৃত-ভাষায় প্রথম শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাল্মীকিই উহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কবি-গুরু বা আদিকবি বলিয়া থাকে।

প্রশ্ন।

১। বাল্মীকি কে ছিলেন? তাঁহাকে আদিকবি বলা হয় কেন?

২। মুনিরা কি রকম স্থানে বাস করিতেন? সরল ভাষায় তাহা বর্ণনা কর।

৩। সবুজ, বাসা, আড়াল, খেলা, আগে, ছট্‌ফট্‌,—এই শব্দগুলিকে ভাল শব্দে রূপান্তরিত কর।

৪। ছন্দ, নিক্ষেপ, প্রকৃতি, আশ্চর্য্যজনক, দুঃখজ্বালা, শোকতাপ,—এইগুলির সরল অর্থ লিখ।

৫। "নীল অম্বর যাহার", "মুখ চন্দ্রের ন্যায়," "শোকরূপ সাগর," "সমুদ্র পর্য্যন্ত,"—এইগুলির প্রত্যেকটির অর্থ এক একটি পদ দ্বারা প্রকাশ কর।

৬। জগদীশ্বর, ক্ষুধার্ত্ত, তপোবন,—এগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

৭। ঊর্দ্ধ, কৃপণ, গ্রহণ, শোক, দাতা,—এইগুলির বিপরীত অর্থ-বোধক শব্দ কি কি হইবে?

বাঙ্গালী বীর।

স্বার্থপর ও অত্যাচারী জর্ম্মণদিগকে দমন করিবার জন্য আমাদের সম্রাট্ চারিবৎসর যে মহাযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার কথা বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। বাঙ্গালী যুবকগণও এই যুদ্ধে সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। তোমরা এই পাঠে একজন বাঙ্গালী-বীরের পরিচয় পাইবে।

বাখরগঞ্জ জেলা-নিবাসী ব্যারিষ্টার প্যারীলাল রায় মহাশয়ের পুত্র ইন্দ্রলাল রায় যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। কি লেখাপড়ায়, কি নানাপ্রকার খেলায় কিছুতেই ইন্দ্রলালকে কেহ হারাইতে পারিত না। বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি তিনটি

বিষয়ে প্রথম হইয়াছিলেন। ইন্দ্রলাল এক মুহূর্ত্তও আলস্যে কাটাইতেন না। যখন লেখাপড়ার কাজ থাকিত না, তখন তিনি কলকারখানার কাজ শিক্ষা করিতেন এবং কখন কখন নিজের হাতে নূতন কল নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যখন বিলাতের শত শত যুবক সৈনিক হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্রলালের মনেও ঐরূপ ইচ্ছা হইল। তিনি পরীক্ষার কথা ভুলিয়া সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করিলেন। ইন্দ্রলালের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যপরীক্ষক যখন তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করিলেন, তখন তাঁহার চক্ষুরোগ ধরা পড়িয়া গেল। যুদ্ধে সৈনিকদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এই কারণে ইন্দ্রলাল প্রথমবার সৈনিক হইতে পারিলেন না।

ইন্দ্রলাল ইহাতে একবারে হতাশ হয়েন নাই। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার দৃষ্টির যে সামান্য দোষ আছে, তাহাতে যুদ্ধকার্য্যের বিঘ্ন হইবে না। তাঁহার হাতে তখন এরূপ অর্থ ছিল না যে, তিনি দর্শনী দিয়া কোনও চিকিৎসক দ্বারা পুনরায় চক্ষু পরীক্ষা করাইবেন। তাঁহার নিজের একখানি বাইসিকেল গাড়ী ছিল। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি গাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং ইংলণ্ডের কোনও বিখ্যাত চিকিৎসককে তাহা দর্শনীস্বরূপে দিয়া চক্ষু দুইটি ভাল

করিয়া পরীক্ষা করাইলেন। চিকিৎসক বহুক্ষণ চক্ষু পরীক্ষা করিলেন এবং চক্ষুর সামান্য দোষও জানিতে পারিলেন, কিন্তু তাহার জন্য যে ইন্দ্রলাল সৈনিক হইবার অযোগ্য হইবেন, ইহা চিকিৎসকের মনে হইল না। চিকিৎসকের এই অভিমত লিখিয়া লইয়া ইন্দ্রলাল আনন্দে ফিরিয়া আসিলেন। এখন সৈনিক হইবার পক্ষে আর বাধা রহিল না,—তিনি অচিরে সৈনিকদলে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ব্বে সৈন্যগণ জলে ও স্থলে যুদ্ধ করিত। এবার আকাশেও যুদ্ধ চলিয়াছিল। কেহ সেনাদলে প্রবেশ করিলে, সে কোন্ প্রকার যুদ্ধের যোগ্য হইবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা হয়। এই পরীক্ষায় ইন্দ্রলালকে আকাশ-যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। তিনি এমন দক্ষতার সহিত আকাশ-যুদ্ধের সকল কার্য্য করিতেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যাইত। একদা আকাশে বেড়াইবার সময়ে তাঁহার বিমান হঠাৎ শত্রুর গোলার আঘাতে ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। পতনের আঘাতে তাঁহাকে তিন মাস শয্যায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার উৎসাহ কমে নাই। আরোগ্য লাভ করিয়াই তিনি আবার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন।

এরোপ্লেন

যুদ্ধের শেষ বৎসরে একদিন প্রাতে ইন্দ্রলাল আকাশের এক প্রান্তে তিনখানি শত্রু-বিমান দেখিতে পাইলেন। সেগুলি আকাশ হইতে গোলা ফেলিয়া ইংরেজপক্ষের অনিষ্ট করিবার আয়োজন করিতেছিল। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রলাল তৎক্ষণাৎ একখানি বিমান সজ্জিত করিয়া আরও তুইজন যোদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া আকাশপথে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মেঘ-কুয়াসা ভেদ করিয়া বিমান-খানি বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় আকাশে উঠিতে লাগিল। শিবিরের সৈন্যগণ দূরবীক্ষণ দিয়া তাঁহার এই কার্য্য দেখিতে লাগিল।

ক্রমে উভয়পক্ষে আকাশে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নীচের লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া যুদ্ধের ফলাফল দেখিতে লাগিল। শত্রুপক্ষের তিনখানি যুদ্ধ-বিমানের মধ্যে তুইখানি নষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল এবং অপরখানি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। সকলে বীর ইন্দ্রলালের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, একটু পরেই দেখা গেল ইন্দ্রলালের বিমানে আগুন লাগিয়াছে এবং তাহা দ্রুতবেগে ভূতলের দিকে নামিয়া আসিতেছে! প্রায় তুই হাজার ফুট্ ঊর্দ্ধে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই স্থান হইতে পড়িলে কেহই জীবিত থাকিতে পারিবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে ইন্দ্রলালের বিমান অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় তাহা পতিত হইল কিছুই জানা গেল না।

ইন্দ্রলাল মরিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন, উহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়।

প্রশ্ন।

১। ইন্দ্রলাল কেন বীর বলিয়া গণ্য হইয়াছেন?

২। ইন্দ্রলালের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বল।

৩। দর্শনী, মুহূর্ত্ত, অভিমত, তীক্ষ্ণ, বিমান, ভূপতিত,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৪। "ইন্দ্রলাল এক মুহূর্ত্তও আলস্যে কাটাইতেন না।" এই বাক্যের প্রত্যেক শব্দটির পদ-পরিচয় দাও।

৫। বিখ্যাত, অযোগ্য, দোষ, উৎসাহ,—এইগুলির বিপরীত অর্থবোধক শব্দ বল।

৬। "পক্ষী" শব্দটির একার্থবোধক চারিটি শব্দ বল।

৭। অবগত—অপগত; অণু—অনু; দ্বীপ—দীপ; আপন—আপণ;—এই সকল শব্দযুগ্মের প্রত্যেকটির অর্থ বল।

৮। আকাশ, সৌন্দর্য্য, হিংসা, মুখ, পিতা,—এইগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত কর।

খুদাবক্স্ লাইব্রেরী।

বিহারের বাঁকিপুরে "খুদাবক্স লাইব্রেরী" নামক বৃহৎ পুস্তকালয় আছে। সেখানে পারসী ও আরবী ভাষায় হাতে-লেখা যে সকল অতিপ্রাচীন কেতাব আছে, তাহা ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে নাই। এই সকল কেতাবের মূল্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা। যে সকল ছাপান পুস্তক এবং প্রাচীন চিত্রাদি আছে, তাহার মূল্যও লক্ষ টাকা হইবে। একটি বৃহৎ অট্টালিকায় এই সকল কেতাব ও চিত্রাদি সযত্নে রাখা হইয়াছে। এই অট্টালিকা নির্ম্মাণেও প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

এই কথাগুলি বলিলে মনে হয়, যেন দেশের শত শত লোকের চেষ্টায় এবং অজস্র অর্থব্যয়ে "খুদাবক্স্ লাইব্রেরীর" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; কিন্তু তাহা হয় নাই। কেবল খুদাবক্স্ খাঁ বাহাদুরের চেষ্টাতেই এই অপূর্ব্ব পুস্তকালয় বিখ্যাত হইয়াছে। দেশের সাহিত্যকে বজায় রাখিয়া লোকশিক্ষার জন্য এইপ্রকার আয়োজন বর্ত্তমান ভারতে অল্প লোকেই করিয়াছেন। এই পুস্তকালয়টি খুদাবক্স্ নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখেন নাই ; জন-সাধারণই এখন ইহার অধিকারী।

প্রায় আশী বৎসর আগে ছাপরা জেলার এক মুসলমান বংশে খুদাবক্স্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ্ বক্স্ তখন পাটনার উকীল। তিনি ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের জন্য দেশে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মহম্মদ্ বক্সের গৃহে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন আরবী ও পারসী পুঁথি ছিল; আরও কিছু কেতাব সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি এই কার্য্যে হাত দিতে পারেন নাই। যখন মহম্মদ্ বক্স্ মৃত্যু-শয্যায় শয়ান, তখন একদিন তিনি পুত্র খুদাবক্স্‌কে আহ্বান করিয়া বলিলেন,— বিখ্যাত আরবী ও পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা সাধারণের জন্য দান করিতে হইবে। মহম্মদ্ বক্স্ অর্থশালী ছিলেন না, এবং খুদাবক্স্ নিজেও তখন উপার্জ্জনক্ষম হয়েন নাই; তথাপি তিনি পিতার এই শেষ আদেশ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন। "খুদাবক্স্ লাইব্রেরী"-রূপ কীর্ত্তি মহম্মদ্ বক্সের এই আদেশের ফল ও খুদাবক্সের অদ্ভুত পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খুদাবক্স্ কিছুকাল পাটনায় এবং শেষে কয়েক বৎসর কলিকাতায় ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় অবলম্বন করিতে হইল। বহু

খুদাবক্স্ খাঁ বাহাদুর (যষ্টি হস্তে)।

চেষ্টায় তিনি জজ্ আদালতের পেশ্কার হইলেন। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি অধিক দিন নিযুক্ত থাকিতে পারিলেন না। অর্থোপার্জ্জন করিয়া কি প্রকারে পিতার আদেশ পালন করা যাইবে, তিনি তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন উকীলের ব্যবসায়ে বিশেষ অর্থাগম হইত; কয়েক বৎসর আইন শিক্ষা করিয়া, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই হইতে তাঁহার অর্থাগঁমের পথ খুলিয়া গেল। তিনি এরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন যে, বাঁকিপুরের আদালতে কার্য্যারম্ভের দিনেই শতাধিক ব্যক্তি তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল। ওকালতীতে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রচুর অর্থলাভ হইয়াছিল এবং শেষে তিনি সরকারী উকীলের পদও লাভ করিয়াছিলেন।

খুদাবক্সের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। মোকদ্দমার কাগজপত্র একবারমাত্র পাঠ করিয়া, তিনি তৎসম্বন্ধে সকল কথা মনে রাখিতে পারিতেন। তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিয়া এক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সব্জজের পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করেন নাই। খুদাবক্স্ বিনা পারিশ্রমিকে যে কত দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া, সে সময়ে আর কেহই

খুদাবক্স লাইব্রেরীর অভ্যন্তরভাগ।
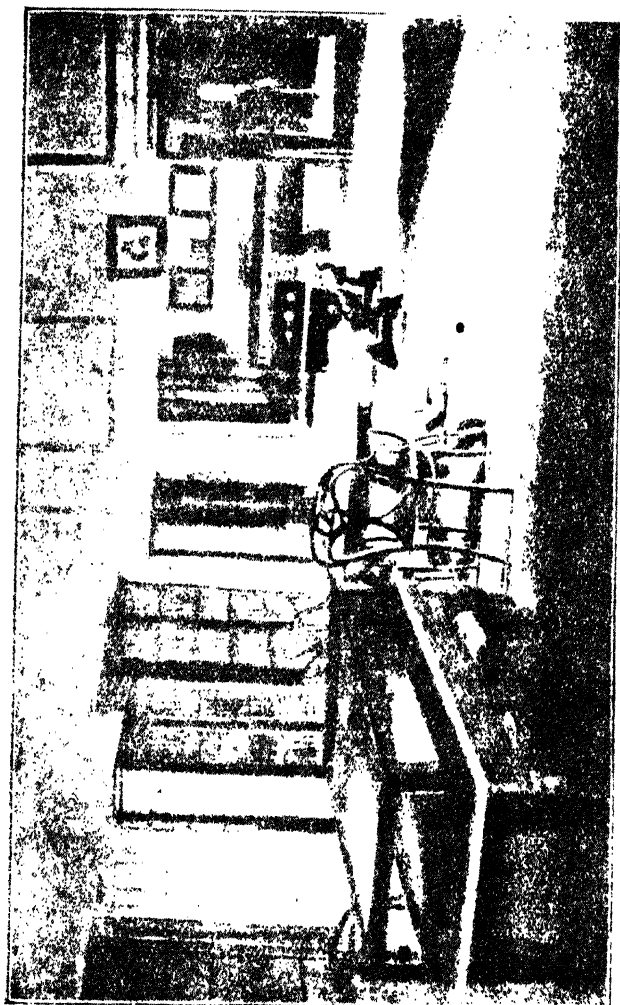
আইন-ব্যবসায়ে এত সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। গুণগ্রাহী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তাঁহার প্রচুর সম্মান ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লী-দরবারে তিনি সম্মানলিপি (সার্টিফিকেট অব্ অনার) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপর "খাঁ বাহাদুর" ও "সি, আই, ই" প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তাঁহার ভাগ্যে বাঁকিপুরে বাস ঘটিয়া উঠে নাই। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের অনুরোধে তাঁহাকে কয়েক বৎসর নিজাম রাজ্যে বিচারপতির কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

পুস্তকাগারের জন্য হস্তলিখিত কেতাব-সংগ্রহে তাঁহাকে যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। মুসলমান রাজত্বের সময়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থমাত্রই দিল্লীর সম্রাটদিগের পাঠাগারে রক্ষিত হইত। তাঁহারা অনেক টাকা দিয়া দুষ্প্রাপ্য কেতাব কিনিতেন। সম্রাট্ আকবরের সভা-কবি ফৈজির সংগৃহীত পাঁচ হাজার কেতাব দিল্লীতেই ছিল। কিন্তু পরে সেই পুঁথিগুলি ভারতের নানা অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া খুদাবক্স্ সেই সকল গ্রন্থের সন্ধান করিতেন এবং শত শত টাকা দিয়া তাহার এক-একখানি ক্রয় করিতেন। প্রাচীন গ্রন্থ পাইলে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি

অর্থব্যয়ে কৃপণতা করিতেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর একজন আরবদেশীয় পণ্ডিতকে কেবল পুঁথি-সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার জন্য খুদাবক্স্ তাঁহাকে বহু ব্যয়ে আরব, পারস্য, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দূরদেশে পাঠাইতেন, এবং সেই সকল স্থান হইতে অনেক প্রাচীন পুঁথি ভারতবর্ষে আনিতেন। নিজামরাজ্যে থাকার সময়ে খুদাবক্স্ স্বয়ং অনেক হস্তলিখিত কেতাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পুরাতন পুস্তকের দোকান দেখিলেই তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া দোকানের পুস্তকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। কথিত আছে, একদিন হায়দরাবাদের আদালত হইতে বাসায় ফিরিবার সময়ে তিনি কোন মুদীর দোকানে কতকগুলি পুরাতন কাগজ দেখিয়াছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার গৃহে আসা হইল না। মুদীর দোকানে বসিয়া তিনি সেই সকল পুরাতন কাগজ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং শেষে সমস্ত কাগজের স্তূপ কুড়ি টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলেন। এই ছিন্ন কাগজগুলির মধ্যে তিনি আরবী ভাষায় লিখিত একখানি দুষ্প্রাপ্য কেতাব পাইয়াছিলেন।

এই রকমে খুদাবক্স্ যে সকল পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় "খুদাবক্স্ লাইব্রেরী"তে

আছে। এই পাঠাগারের পুস্তকাবলী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল। জীবনের শেষভাগ ঈশ্বরচিন্তায় ক্ষেপণ করিবার জন্য যখন তিনি হায়দরাবাদ হইতে বাঁকিপুরে আসিলেন, তখন অধিকাংশ সময়ই পুস্তকাগারের এক নির্জ্জনস্থানে থাকিতেন। তাঁহার শুভ্র কেশ ও শান্ত মুখশ্রী দেখিলে আপনা হইতেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইত।

সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া খুদাবক্স্ অকালে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; এজন্য অধিককাল বিশ্রাম সুখ উপভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই পুণ্যাত্মা দেহত্যাগ করেন। লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণেই তাঁহার সমাধি আছে। তিনি যেমন আড়ম্বরশূন্য হইয়া জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার সমাধিস্থানটি তদনুরূপ করিয়া অতি-সাধারণভাবে নির্ম্মিত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন।

১। অট্টালিকা, অজস্র, স্থাপন, গুণগ্রাহী, উপাধি, দুষ্প্রাপ্য, হস্তলিখিত, প্রাঙ্গণ, আড়ম্বরশূন্য,—এই শব্দগুলির অর্থ লিখ।

২। খুদাবক্স্ কি প্রকার কষ্টে প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার দুইটি উদাহরণ দাও।

৩। অর্থোপার্জ্জন, দুষ্প্রাপ্য, শতাধিক, পুস্তকাবলি,—এই শব্দগুলির সন্ধি-বিচ্ছেদ কর এবং সূত্র বল।

৪। অধিকারী, লোকপ্রিয়, আড়ম্বরশূন্য, কৃপণ,—এই বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর।

৫। "খুদাবক্স্ লাইব্রেরী, খুদাবক্সের অদ্ভুত পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" এই কথাটির সার্থকতা কোথায়? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। কৃপণতা, সংগৃহীত, সফলতা, অর্থলাভ,—এই শব্দগুলির এক একটি লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

শিষ্টাচার।

(১)

সুলতান নাসিরুদ্দিন নানাগুণে পাঠান নৃপতিদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াও ফকিরের মত ব্যবহার করিতেন। নিজের প্রয়োজনে তিনি রাজকোষ হইতে কখন একটি মুদ্রাও ব্যয় করেন নাই। তাঁহার হস্তাক্ষর অতিসুন্দর ছিল। অর্থের অভাব হইলে কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক তিনি নিজের হাতে নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন। এই প্রকারে যাহা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। নাসিরুদ্দিন কখনও কাহাকেও কটুকথা বলিতেন না এবং যাহাতে লোকে মনে কষ্ট পায় এ

প্রকার আচরণও করিতেন না। তাঁহার শিষ্টাচারের একটি সুন্দর উদাহরণ ইতিহাসে লিখিত আছে।

একদা নাসিরুদ্দিন তাঁহার নিজের হাতে লেখা কোন পুস্তক এক মৌলবীকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। মৌলবী তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "পুস্তক অতি সুন্দর হইয়াছে ; কিন্তু উহার একস্থানে যে একটু ভুল আছে, তাহার সংশোধন প্রয়োজন।" নাসিরুদ্দিন ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পুস্তক-খানি একবার ভাল করিয়া পড়িলেন এবং মৌলবী যে ভুলের কথা বলিয়াছিলেন তাহার সংশোধন করিয়া রাখিলেন।

বাদসাহের উপকার করা হইল ভাবিয়া মৌলবী আনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলে, নাসিরুদ্দিন আবার পুস্তকখানি পড়িলেন এবং সংশোধিত অংশ কাটিয়া পূর্ব্বে সেখানে যাহা লেখা ছিল তাহাই লিখিয়া রাখিলেন। অমাত্যগণ নাসিরুদ্দিনের এই কার্য্য দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"মৌলবী যে অংশ ভুল বলিয়াছিলেন, তাহা ভুল নয়। পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ও লজ্জিত হন, এই জন্য তাঁহার কথা-অনুসারে পুস্তক সংশোধন করিয়াছিলাম।"

অমাত্যগণ বাদসাহ নাসিরুদ্দিনের এই শিষ্টাচার দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

২

আমাদের পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের একটি শিষ্টাচারের কথা তোমাদিগকে বলিব।

একদা আফ্রিকার কোন ক্ষুদ্র রাজা সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইংলণ্ডে আসিয়া-

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

ছিলেন। দেখা-শুনা শেষ হইয়া গেলে, সম্রাট্ এক-দিন রাজাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

আহারের সময়ে উচ্ছিষ্ট খাদ্য ভোজনপাত্রের চারি-দিকে ছিটাইয়া ফেলা ভাল নয়; অনেক সভ্যসমাজেই ইহা নিন্দনীয়। আফ্রিকার রাজা ইহা জানিতেন না। তিনি আহারে বসিয়া উচ্ছিষ্ট খাদ্য টেবিলের উপরে

এবং কখন কখন টেবিলের নীচে ছিটাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ বুঝিতে পারিলেন, বিদেশী রাজা ভোজনের রীতি জানেন না বলিয়াই এইরূপ করিতেছেন। কিন্তু পাছে তিনি অপ্রতিভ ও দুঃখিত হন, এই ভাবিয়া সম্রাট্ রাজাকে সভ্যভাবে আহার করিতে না বলিয়া নিজেও রাজার অনুকরণে উচ্ছিষ্ট খাদ্য চারিদিকে ছিটাইতে লাগিলেন। সে দিন সম্রাটের সুসজ্জিত আহারের ঘর উচ্ছিষ্ট আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া গেল।

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড এই প্রকারে যে শিষ্টাচার দেখাইয়াছেন, অতিথি রাজা বোধ হয় তাহা জানিতে পারেন নাই; কিন্তু সম্রাটের সহচর ও ভৃত্যগণ তাহা বুঝিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল।

প্রশ্ন।

১। শিষ্টাচার কাহাকে বলে? সুলতান নাসিরুদ্দিনের এবং সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের শিষ্টাচারের বিষয় গল্প করিয়া বল।

২। ভোজনপাত্র, সহচর, সুসজ্জিত, কটুকথা,—এইগুলির ব্যাসবাক্য বল এবং প্রত্যেক স্থলে কোন্ সমাস হইয়াছে বল।

৩। উপকার, সুন্দর, দুঃখ, খাদ্য, নিন্দা,—এই শব্দগুলির বিপরীত অর্থবোধক শব্দ কি কি হইবে?

৪। অনুকরণ শব্দের অর্থ কি? অনু উপসর্গযোগে পাঁচটি শব্দ রচনা কর।

৫। শিষ্টাচার, উচ্ছিষ্ট,—এই দুইটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

কাজি ও কপট সন্ন্যাসী।

(১)

অনেক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে সনাতন নামে এক ভিক্ষুক বাস করিত। একটি যুবক পুত্র ব্যতীত তাহার আর কেহই ছিল না। বৃদ্ধবয়সে সে একবার বৃন্দাবন যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। তখন রেল-গাড়ী ছিল না, দরিদ্র ব্যক্তিরা হাঁটিয়াই তীর্থ করিতে যাইত। বৃদ্ধ ও অক্ষম যাত্রীরা অনেক সময়ে পথের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া পীড়িত হইত এবং কখন বা পথেই মারা যাইত। বৃদ্ধ পিতাকে একাকী দেশান্তরে যাইতে দেখিয়া পুত্রও পিতার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিল। অবশেষে সনাতন ও তাহার পুত্রের বৃন্দাবনযাত্রা স্থির হইয়া গেল।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু ঘরের জিনিষ-পত্র কাহার নিকটে রাখা হইবে, তাহা সনাতন স্থির করিতে পারিল না। গ্রামে চোর-ডাকাতের উৎপাত ছিল, সুতরাং কিছুই ঘরে রাখিয়া যাওয়া উচিত মনে হইল না। এই সময়ে গ্রামের শেষে একটি ভাঙ্গা মন্দিরে এক সন্ন্যাসী বাস করিত। গ্রামবাসীরা তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু সন্ন্যাসী শ্রদ্ধার পাত্র ছিল না। সাধুর বেশে সাধারণকে ঠকাইয়া রোজগার করাই

তাহার লক্ষ্য ছিল। সনাতন সরল বিশ্বাসে ঐ সন্ন্যাসীর নিকট সকলই রাখিয়া তীর্থযাত্রা করিবে ঠিক্ করিল। শেষে একদিন গভীর রাত্রিতে সেই ভাঙ্গা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে তাহার সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া পরদিন প্রত্যূষে বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

কয়েকমাস পরে সনাতন ও তাহার পুত্র ঘরে ফিরিয়াই গচ্ছিত জিনিষপত্র লইবার জন্য সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী কিছুই ফিরাইয়া দিল না বরং সনাতন ও তাহার পুত্রকে বহু কটুকথা বলিয়া মারিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসীর এই ব্যবহারে অপমানিত হইয়া পিতাপুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিল।

এই সময়ে নবদ্বীপে একজন কাজি ছিলেন ; তাঁহার শাসনে এবং সুবিচারে সকলেই পরম শান্তিতে বাস করিত। ভণ্ড সন্ন্যাসীর নিকট হইতে দ্রব্যাদি ফিরাইয়া পাইবার উপায় নাই দেখিয়া সনাতন কাজি সাহেবের নিকট নালিশ করিল। তিনি সনাতনের মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—"তুমি হঠাৎ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। যাহা হউক, আগামী কল্য প্রত্যূষে তুমি একবার আমার নিকটে আসিও, ধন ফিরিয়া পাইবার উপায় তখন জানিতে পারিবে।"

(২)

সনাতনকে বিদায় দিয়া কাজি সাহেব সে দিন অন্য কাজে মন দিতে পারিলেন না। কি উপায়ে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে দ্রব্যাদি ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, তিনি সমস্ত দিন কেবল সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক উপায় স্থির হইল।

গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ এবং পথ নির্জ্জন, তখন কাজি সাহেব ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর সেই মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কাজিকে দেখিয়া সন্ন্যাসী ভীত হইল এবং মনে করিল হয় ত সনাতনের গচ্ছিত দ্রব্যের উদ্ধারের জন্যই তিনি আসিয়াছেন। কাজি সাহেব সন্ন্যাসীকে বলিলেন,—"অসময়ে আমাকে এখানে দেখিয়া আপনি ভীত হইবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। আগামী পরশ্ব আমাকে রাজধানী যাইতে হইবে। কতদিন সেখানে থাকিতে হইবে জানি না। এখন আমার ধনসম্পত্তি কাহার নিকটে গচ্ছিত রাখিব স্থির করিতে পারিতেছি না। ভৃত্যদের নিকট কিছুই রাখা উচিত নয়, কারণ তাহারা মূর্খ ও প্রতারক। অতএব এই সঙ্কটকালে আপনি আমার সর্ব্বস্ব নিজের কাছে গচ্ছিত রাখুন। এই নবদ্বীপে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক এবং সংসারবিরাগী সাধু পুরুষ আর নাই।"

কাজি সাহেবের কথায় সন্ন্যাসীর সকল ভয় দূর হইল। সে চিন্তা করিতে লাগিল, সনাতনকে ঠকাইয়া সে যে অর্থ পাইয়াছে, কাজি সাহেবকে ঠকাইলে তাহার হাজার-গুণ অর্থ লাভ করিবে। অনেক বিনয়োক্তির পর সে কাজির প্রস্তাবে সম্মত হইল। স্থির হইল, পর রাত্রিতে কাজি সাহেব স্বয়ং আসিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন।

(৩)

পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে প্রভাতে সনাতন বিষণ্নমনে আবার কাজি সাহেবের নিকটে গেল। তাহাকে দেখিয়াই কাজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আর ভয় নাই। তোমার দ্রব্যাদি আজই ফেরত পাইবে। তুমি এখনই সন্ন্যাসীর নিকটে গমন কর এবং ধন ফিরাইয়া দিবার জন্য তাহাকে আবার অনুরোধ কর। যদি ইহাতেও সে ধন ফিরাইয়া না দেয়, তবে তাহাকে বলিও যে, ধন আদায় করিবার জন্য কাজির আদালতে আজই নালিশ করা হইবে।"

কাজি সাহেবের এই আদেশ পাইয়া সনাতন সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া গচ্ছিত দ্রব্যাদি ফেরত পাইবার জন্য আবার অনুনয় করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসী এবারেও পূর্ব্বের মত কর্কশ কথা বলিয়া সনাতনকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তখন কাজি সাহেবের

উপদেশ স্মরণ করিয়া সে সন্ন্যাসীকে বলিল,—"আপনি যদি একান্তই আমার ধন ফেরত না দেন, তবে আমি এখনই কাজির আদালতে নালিশ করিব।"

সনাতনের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ভয় পাইল। সে ভাবিতে লাগিল, সনাতনকে ফাঁকি দেওয়ার খবর এখনও কাজির নিকটে পৌঁছায় নাই। কোনক্রমে এই খবর শুনিলে তিনি কখনই তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না এবং ধনসম্পত্তিও তাহার নিকটে রাখিবেন না। অতএব সনাতনের সামান্য ধনের লোভে কাজি সাহেবের বহুধনের আশা ত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়।

এই প্রকার চিন্তার পর হঠাৎ সন্ন্যাসী খুব নরম হইয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে সনাতনকে বলিল,—"তুমি কি সত্যই আমাকে চোর মনে করিলে? আমার ন্যায় সন্ন্যাসী কখনই পরের দ্রব্য লইবার ইচ্ছা করে না। তোমার দ্রব্য আমার কাছেই আছে। পরিহাস করিয়াই এ পর্য্যন্ত ফেরত দিই নাই।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী সনাতনের সকল দ্রব্য ফেরত দিল। সনাতন তাহা পাইয়া সানন্দে গৃহে ফিরিয়া গেল।

(৪)

সন্ন্যাসী সনাতনের ধন ফেরত দিয়াছে শুনিয়া কাজি সাহেব আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এইপ্রকার ভণ্ড

সন্ন্যাসীকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে কাজি সাহেবের ধনসম্পত্তি পাইবার জন্য যখন সন্ন্যাসী মন্দিরের দরজায় প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন হঠাৎ কাজি সাহেবের দশজন পাইক সেখানে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী ভাবিল, ইহারাই বুঝি কাজির ধনসম্পত্তি বহন করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পাইকগণ ধনসম্পত্তির কথা না বলিয়া, সন্ন্যাসীকে তৎক্ষণাৎ গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার আদেশ দিল। সন্ন্যাসী তখন সকলই বুঝিল। সে নীরবে মন্দির ত্যাগ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

প্রশ্ন।

১। এই গল্পটি সরল ভাষায় মুখে মুখে বল।

২। প্রত্যূষ, সন্ন্যাসী, সঙ্কটকাল, সর্ব্বস্ব, গচ্ছিত, সংসার-বিরাগী, সাধু, অনুনয়, কর্কশ, দ্বিপ্রহর,—এই শব্দগুলির সরল অর্থ লিখ।

৩। বীণা—বিনা; লক্ষণ—লক্ষ্মণ; কুল—কূল; অনুকরণ—উপকরণ; ভোজন—ভজন; বৃদ্ধ-পিতামহ—বৃদ্ধ পিতামহ;—এই জোড়া জোড়া শব্দগুলির প্রত্যেকটির অর্থ বল।

৪। বৃন্দাবনযাত্রা, বৃদ্ধবয়স, ধনসম্পত্তি,—এই পদগুলির সমাস-বাক্য লিখ।

৫। "আমার স্নান করা হইয়াছে", "রাম সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন"—এই দুইটি বাক্যের বাচ্যান্তর কর।

৬। "পান করিবার ইচ্ছা," "যাহা সহজে লাভ করা যায় না," "যাহা পান করা যায়," "যাহা আহার করা যায়,"—এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটি একএকটি শব্দ দিয়া ব্যক্ত কর।

৭। চোর, পশু, মনুষ্য,—এই বিশেষ্যগুলি হইতে গুণবাচক বিশেষ্য রচনা কর।

দয়াবতী অহল্যা বাঈ।

তোমরা সকলে বোধ হয়, রাণী অহল্যা বাঈয়ের নাম জান না। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হোলকার রাজ্যের রাণী ছিলেন। ইন্দোর তাঁহার রাজধানী ছিল। অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন; একমাত্র পুত্র মহারাজ মালী রাও বাহাদুরের অকালে মৃত্যু হইলে তিনি হোলকার রাজ্যের রাণী হইয়াছিলেন। কেবল রাণী বলিয়াই অহল্যা বাঈকে লোকে ভক্তি করে না। তিনি সুপণ্ডিতা, তেজস্বিনী ও পরম দয়াবতী ছিলেন,—এই সকল গুণের কথা স্মরণ করিয়াই লোকে অহল্যা বাঈকে আজও ভক্তি করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের প্রায় সকল প্রধান তীর্থস্থানেই রাণী অহল্যার অনেক কীর্ত্তি আছে। গয়ার বিষ্ণুমন্দির, বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ইত্যাদি তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে

দয়াবতী অহল্যা বাঈ।

তিনি যে কত দেবমন্দির, অতিথিশালা এবং ছায়াময় রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাট এবং শত শত সত্র ও ধর্ম্মশালা
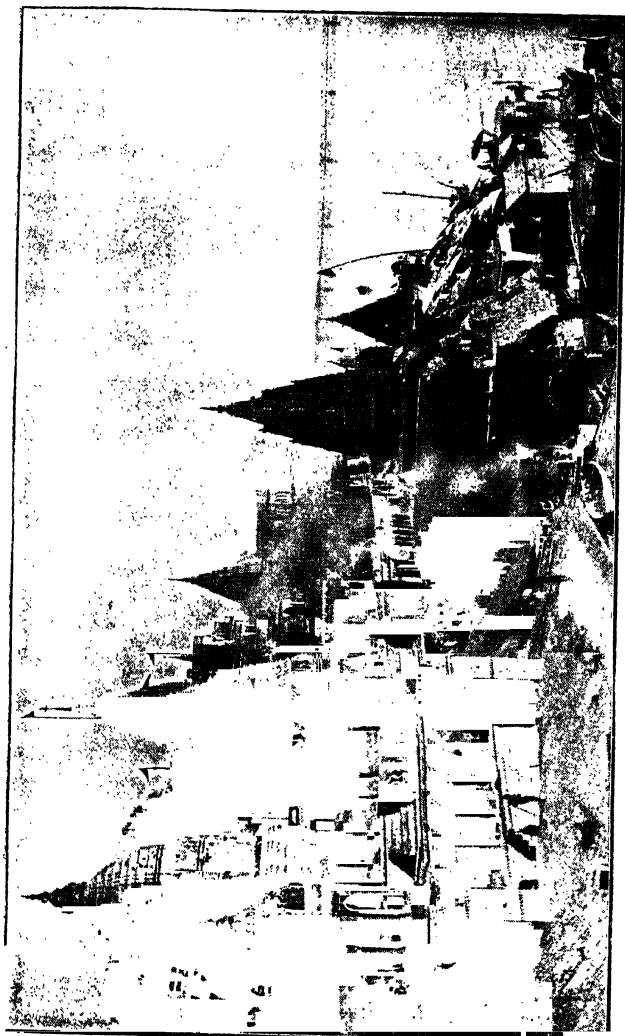
কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাট।

তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত। এখন পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতে হইলে, লোকে রেলপথে যাওয়া-আসা করে। পূর্ব্বে পুরী পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল না এবং ভাল রাজপথও ছিল না। তীর্থযাত্রীরা দুর্গমপথে চলিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইত। রাণী অহল্যা যাত্রীদের ক্লেশ-নিবারণের জন্য পুরী পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজও হাজার হাজার দরিদ্র তীর্থযাত্রী সেই পথে যাতায়াত করে। এই সকল হিতকর কার্য্যে রাণী অহল্যা প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষাদান করা এবং বিপন্নব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা অহল্যা বাঈয়ের নিত্যকর্ম্ম ছিল। প্রত্যহ অতিপ্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়াই তিনি স্নান ও আহ্নিক শেষ করিতেন এবং তাহার পর নিজের হাতে হাজার হাজার দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নবস্ত্র দান করিতেন। পাছে পথিকদের ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট হয়, এই জন্য রাজধানীতে আসিবার পথে বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল জল ও মিষ্টান্ন রাখা হইত। পথিকগণ তাহা উপভোগ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিত।

পশুপক্ষী-প্রভৃতি প্রাণীরাও রাণী অহল্যার দয়া হইতে বঞ্চিত হইত না। তাঁহার রাজ্যের স্থানে স্থানে কয়েক বিঘা জমি কেবল পশুপক্ষীদের জন্যই আবাদ করা হইত। এই সকল ক্ষেত্রের শস্য কাটা হইত না,—

পশুপক্ষীরা ইচ্ছামত তাহা আহার করিত। অহল্যা বাঈয়ের রাজ্যে যত পুষ্করিণী ও হ্রদ ছিল, তাহাতে কেহ মৎস্য ধরিতে পাইত না। রাণীর আদেশে কর্ম্মচারীরা প্রতিদিনই জলাশয়গুলিতে ছাতু ও মুড়ি ছড়াইত। মৎস্য ও অপর জলচর প্রাণিগণ তাহা পরমানন্দে আহার করিত।

রাণী অহল্যা যে কেবল দয়ার কার্য্য করিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন তাহা নয়, রাজ্যশাসনেও তিনি অসাধারণ নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন দেখিয়া রাজ্যের কতকগুলি দুষ্ট প্রজা সিংহাসন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাণী অহল্যা ইহাতে একটুও ভীত হন নাই। নিজের সৈন্যদলের নেত্রী হইয়া দুষ্টদিগকে দণ্ড দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ রাণীর এইরূপ তেজঃ দেখিয়া বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজ্যের ছোট-বড় সকল কার্য্য তিনি নিজেই দেখিয়া শুনিয়া করিতেন। রাজকর্ম্মচারিগণ কেবল তাঁহার আদেশপালন করিতেন মাত্র। রাজ্যের উচ্চতম আদালতে স্বয়ং রাণীই বিচারকার্য্য চালাইতেন। নিতান্ত জটিল মোকদ্দমারও তিনি এমন সুন্দর বিচার করিতেন যে, সকল লোকেই তাঁহার সুবিচারের সুখ্যাতি করিত।

রাণী অহল্যা বাঈয়ের ন্যায় গুণবতী নারী ভারতবর্ষে অতিঅল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন।

১। অহল্যা বাঈকে "দয়াবতী" বলা হইল কেন? তাঁহার জীবনের দুইটি কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। যাত্রী, দরিদ্র, দর্শন, ভক্তি, ভিক্ষা, নিপুণ, পশু, দুষ্ট, পথ, সুন্দর, স্মরণ,—এই কথাগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষণ আছে সেগুলিকে বিশেষ্যে এবং যেগুলি বিশেষ্য আছে সেগুলিকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর।

৩। দেবমন্দির, পশুপক্ষী, শত্রুপক্ষ, মিষ্টান্ন, নিত্যকর্ম্ম,—এ-গুলির সমাসবাক্য বল এবং কোন্‌টিতে কোন্ সমাস হইয়াছে উল্লেখ কর।

৪। ভক্তি, রাজপথ, হিতকর, বঞ্চিত, সুবিচার, জলাশয়,—এগুলির অর্থ বল এবং প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

৫। "বৃক্ষচ্ছায়া" এই কথাটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর এবং সেই সূত্র অনুসারে নিষ্পন্ন আরও দুইটি শব্দ রচনা কর। বর্ণ+ছত্র, কৃষ্ণ+ছাগ,—সন্ধি করিলে কি হইবে?

৬। নেত্রী, দয়াবতী, বিশ্বেশ্বর, পণ্ডিত, দুষ্ট,—এই কথাগুলির মধ্যে যেগুলি পুংলিঙ্গ আছে সেগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে এবং যেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ আছে সেগুলিকে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর।

৭। "ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা অহল্যার নিত্যকর্ম্ম ছিল।" এই বাক্যটির প্রত্যেক শব্দের পদ-পরিচয় দাও।

৮। পদ কত প্রকার আছে? প্রত্যেক পদের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

পাপের ফল।

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সেইরূপ পাপকর্ম্ম করিলে প্রত্যেক মানুষকেই দণ্ডভোগ করিতে হয়, ইহাও স্বাভাবিক নিয়ম। পাপের ফল অনেক সময় হাতে হাতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। এখানে একটি ঘটনার কথা তোমাদিগকে বলিব।

মোগল-সম্রাট্ আরঙ্গজেবের নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। তিনি নিজ বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ সাজাহানকে বন্দী করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা জীবিত ছিলেন। তিনি অতি সৎলোক ছিলেন। কিন্তু যখন পিতা সাজাহান আরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হইলেন, তখন তাঁহার মনে ভয় হইল। তিনি ক্রমে জানিতে পারিলেন, আরঙ্গজেব তাঁহাকেও বন্দী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কাজেই তিনি আর দিল্লীতে থাকিতে পারিলেন না. প্রাণভয়ে পারস্যদেশে পলাইতে লাগিলেন। তাঁহার গুণবতী স্ত্রী তখন ভয়ানক পীড়িতা, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দারা স্বদেশ

ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পীড়িতা পত্নীকে লইয়া অধিক দূরে যাওয়া হইল না; তিনি পথের মাঝেই জিহন খাঁ-নামক এক ব্যক্তির অতিথি হইলেন। জিহন খাঁ, দারা ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য একটি বাড়ী ছাড়িয়া দিল। দারা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আরঙ্গজেব।

কিন্তু এই সময়ে সামান্য সুখও দারা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী পীড়িতা স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। দারা এই বিপদে সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন এবং পত্নীর সমাধিকার্য্য শেষ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

সহোদরকে এই প্রকারে বিপদে ফেলিয়াও আরঙ্গজেব তৃপ্তি লাভ করেন নাই; তিনি দারাকে ধরিয়া আনিবার জন্য চারিদিকে শত শত চর পাঠাইয়া দিলেন। শোকাতুর দারা এই সংবাদ পাইয়া পত্নীর সমাধি-স্থান ছাড়িয়া সামান্য পথিকের বেশে একাকী

পলাইতে লাগিলেন। কিছুদূর এই প্রকারে চলিলে দেখা গেল, জিহন খাঁ কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দারার অনুসরণ করিতেছে। দারা ভাবিলেন, জিহন্ খাঁ বুঝি বন্ধুভাবেই আসিতেছে। তিনি পথের মাঝে দাঁড়াইয়া জিহন্ খাঁর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর জিহন খাঁ দারার নিকটে আসিয়াই তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। দুঃখে ও ঘৃণায় দারা জিহনকে বলিলেন,—"এই কি বন্ধুতার পরিণাম এবং ইহাকেই কি অতিথিসৎকার বলে? ঈশ্বর আছেন, এই কর্ম্মের ফল তুমি হাতে হাতে পাইবে।"

সম্রাট্ সাজাহানের প্রিয়পুত্র দারা এইপ্রকারে বন্দী হইয়া দিল্লীর রাজপথ দিয়া দীনবেশে আরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। নগরের অধিবাসীরা দারার দুরবস্থা দেখিয়া গোপনে কাঁদিতে লাগিলেন এবং আরঙ্গজেবকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসঘাতক নরাধম জিহন খাঁ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে অনেক সম্মান পাইল বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। দিল্লীবাসীরা জিহনকে দণ্ড দিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সে ভয়ে গৃহের দিকে পলাইতে লাগিল, কিন্তু লুকাইতে পারিল না। পথের মাঝেই উন্মত্ত নগরবাসীদের তরবারির আঘাতে তাহার পাপদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইতে

লাগিল। এই প্রকারে জিহন খাঁ পাপের ফল ভোগ করিয়াছিল।

প্রশ্ন।

১। আগুন, বাড়ী, কান্না, ঘোড়া, লুকান,—এই চলিত শব্দগুলিকে ভাল শব্দে পরিণত কর।

২। পাপ কাহাকে বলে? এই গল্পে কে পাপ করিয়াছিল?

৩। "পাপ করিলেই প্রত্যেক মানুষকেই দণ্ডভোগ করিতে হয়।" এই বাক্যটির অর্থ সরল ভাষায় বল। এই গল্পে কে পাপ করিয়া কোন্ দণ্ড ভোগ করিয়াছিল?

৪। বিশ্বাসঘাতক, নরাধম, পরিণাম, প্রতীক্ষা, সমাধি-কার্য্য, শোকাতুর, নিষ্ঠুর, পাপদেহ,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৫। অতিথিসৎকার কাহাকে বলে? জিহন খাঁ অতিথি-সৎকার করিয়াছিল কি?

ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শোভা বড়ই রমণীয়। ইহার বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, পরমেশ্বর যেন সকল জগতের সৌন্দর্য্য একস্থানে দর্শন করিবার জন্য এই দেশের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার কোথাও উচ্চ পর্ব্বতমালা, কোথাও বা বিস্তীর্ণ মালভূমি; কোথাও বালুকাময় মরু, কোথাও বা শস্যশ্যামল ভূভাগ;

কোথাও জনাকীর্ণ নগর, কোথাও বিজন অরণ্য। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হাজার মাইল এবং প্রস্থও প্রায় তৎপরিমাণ। ইহার নানা অংশে নানা জাতি লোক বাস করে। তাহাদের আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি একরূপ নহে। ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে বিন্ধ্য পর্ব্বত ও সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী। বিন্ধ্যের উত্তরখণ্ডের নাম আর্য্যাবর্ত্ত; দক্ষিণখণ্ডের নাম দক্ষিণাপথ। আর্য্যাবর্ত্ত দক্ষিণাপথ অপেক্ষা নিম্ন, সমতল ও উর্ব্বর। দক্ষিণাপথ উন্নত, অসম, পর্ব্বত-বহুল। ইহার দুই দিকে পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট নামে পর্ব্বতশ্রেণী ভারতের দক্ষিণখণ্ডকে প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যাংশে যুক্তপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব, রাজপুতানা ও সিন্ধুপ্রদেশ এবং উত্তরপূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও আসাম রহিয়াছে। গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এই তিন নদী ভারতবর্ষকে সুজলা করিয়াছে। গঙ্গার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় হাজার মাইল। গঙ্গার একটি উপনদীর নাম যমুনা। গঙ্গা ও যমুনা নদী হিন্দুগণের নিকটে পরম পবিত্র। ভারতের রাজধানী দিল্লী যমুনার তীরে এবং বারাণসী গঙ্গার তীরে আছে। যমুনা ব্যতীত গঙ্গার আরও কয়েকটি উপনদী আছে। তন্মধ্যে গণ্ডক, শোণ ও কুশীর নাম প্রসিদ্ধ। সিন্ধুর পঞ্চ উপনদী শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা হইতে পঞ্জাব নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত নদ-নদীসত্ত্বেও, উত্তর ভারতের এক অংশে অর্থাৎ রাজপুতানা ও সিন্ধু-দেশের কিয়দংশে এক সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি বিদ্যমান। এই মরুভূমিতে বৃক্ষ ও জলের লেশমাত্র নাই। গ্রীষ্মকালে এই স্থান হইতে ভয়ানক উষ্ণ বায়ু বহিতে থাকে। ইহার নাম লু। এই মরুভূমির নিকটে রাজপুতানা প্রদেশে শম্বর নামে একটি হ্রদ ও লুনী নামে এক নদী আছে। ইহাদের জল অত্যন্ত লোণা বলিয়া কেহ পান করিতে পারে না।

ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস পর্ব্বতে জন্মিয়া তিব্বতের উপর দিয়া আসামে আসিয়াছে। তিব্বতে ইহার নাম সান্-পো। আসামের সদিয়ার নিকট হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার নাম ডিহাঙ্গ। পরে ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার যে অংশের নাম ব্রহ্মপুত্র তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে চারিশত মাইল। ইহার উভয় তীরের দৃশ্য পরম মনোরম। আসাম ত্যাগ করিবার কালে ব্রহ্মপুত্র গারো পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং পরে দেড়শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইহা গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এই অংশ যমুনা নামে খ্যাত। ইহার পরে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া উহা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখানে ব্রহ্মপুত্রের মূর্ত্তি

দেখিয়া তাহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের যে সকল শুষ্ক স্থান দিয়া গঙ্গা ও সিন্ধুর ধারা প্রবাহিত, খাল খনন করিয়া নদীর জল চারিদিকে লইয়া না গেলে তথায় কৃষিকার্য্য চলে না। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের জলরাশিকে সে প্রকারে কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। হিমালয় ও আসামের উচ্চ স্থান হইতে ইহার প্রবাহের সহিত যে মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া আইসে, তাহা দুই কূলের বিস্তীর্ণ ভূমির উপরে সঞ্চিত হইয়া প্রতিবৎসরেই ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে থাকে।

সমুদ্রতীর হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় চারিশত ক্রোশ। এই দীর্ঘ জলপথে বাষ্পীয় পোত ও নৌকা বৎসরের সকল সময়েই গমনাগমন করিতে পারে। এই সুযোগে ব্যবসায়িগণ আসাম হইতে চা, কাষ্ঠ, তূলা এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাট, তামাক, ধান্যাদি শস্য নানা দেশে প্রেরণ করেন এবং বিদেশ হইতে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বদেশে আনয়ন করেন।

দক্ষিণভারতে গঙ্গার ন্যায় দীর্ঘ নদী নাই। কিন্তু নর্ম্মদা নামে নদী অমরকণ্টকে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া

বোম্বাই প্রদেশকে ধনধান্যশালী করিয়াছে, উত্তর-ভারতের গঙ্গার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। গঙ্গার ন্যায় ইহারও উভয় কূলে অসংখ্য দেবমন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক পৌরাণিক ঘটনার সহিত এই নদীর নাম জড়িত থাকায়, হিন্দুগণ ইহাকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। জব্বলপুরের নিকটে নর্ম্মদা তীরে এক মর্ম্মরপর্ব্বত দণ্ডায়মান আছে। ইহার দৃশ্য জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লী, ফতেপুর-শিক্রি, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের কীর্ত্তি এবং সিমলা, দারজিলিং, কলিকাতা প্রভৃতি ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত স্থানের সৌন্দর্য্যের ন্যায় জব্বলপুরের মর্ম্মরপর্ব্বতও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মন হরণ করিয়া থাকে। তাপ্তী নদীর উভয় কূলের দৃশ্যও পরম মনোরম।

দক্ষিণভারতের অপর নদীসমূহের কথা মনে করিলে নর্ম্মদা তাপ্তীর পরেই গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর কথা মনে পড়ে। গোদাবরীই এই প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নদী। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী নিজাম বাহাদুরের রাজ্য ভেদ করিয়া ভারতের পূর্ব্ব দিকে সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা যে কত শুষ্ক প্রান্তর এবং কত দুর্গম অরণ্যভূমি ভেদ করিয়া সাগরে

পতিত হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। গোদাবরীতে বৎসরের সকল সময়ে গভীর জল থাকে না বলিয়া, নৌকায় গমনাগমনের সুযোগ নাই। রাজমহেন্দ্রী হইতে পঁচিশ মাইল দূরে গোদাবরীর দৃশ্য অতিসুন্দর। নদীতীরবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে নিবিড় বেণুবন এবং ঘন সেগুন, তিন্তিড়ী ও ডুমুর-জাতীয় বৃক্ষ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে।

কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীও ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণভারতের কোন নদীই গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় গভীর নয়। ভীমা, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি নদী দূর-দূরান্তর হইতে জলরাশি বহন করিয়া কৃষ্ণায় মিলিতা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহাতে বঙ্গদেশের নদীর ন্যায় জল দেখা যায় না। পুরাণপ্রসিদ্ধ কাবেরী নদী মহীশূর রাজ্য ভেদ করিয়া ও সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। বাঙ্গালোরের নিকটে কাবেরীর যে জলপ্রপাত আছে, তাহা ভারতের একটি দর্শনীয় বস্তু।

উত্তরভারতের ন্যায় দক্ষিণাপথে উর্ব্বরা ভূমি অধিক না থাকিলেও, পূর্ব্ব-উপকূলে ইক্ষু, ধান্য, তামাক ও কার্পাস উৎপন্ন হয়। মান্দ্রাজ, আরকট, পণ্ডিচেরী, ত্রিচিনাপলি প্রভৃতি নগর এই অংশেই আছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের মালাবার অঞ্চলে যথেষ্ট ধান্য জন্মে

এবং তাহার নিকটের বনে সেগুন ও চন্দন কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণাপথের নীলগিরি আর একটি উল্লেখযোগ্য মনোরম স্থান। হিমালয় বা আল্‌প্‌স্‌ প্রভৃতি পর্ব্বতের ন্যায় ইহা উচ্চ না হইলেও, যে নিবিড় অরণ্যে ও লতা-পুষ্পফলে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমগ্র বৎসর আবৃত থাকে, তাহাই ইহাকে বিখ্যাত করিয়াছে। উতকামণ্ডনামক স্বাস্থ্যকর নগর এই পর্ব্বতের উপরেই আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য হিমালয়ের উচ্চ অংশ, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি বিখ্যাত হইলেও, ঐ স্থানগুলি দুর্গম বলিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য সকলে উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু নীলগিরিতে সে অসুবিধা নাই।

পর্ব্বতের উপরিস্থিত নগর ।—৬৬ পৃঃ

পদ্যাংশ

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণাকর
যিনি অখিলের স্বামী,
যাঁহার ইচ্ছায়, জীব সমুদায়
জন্ম-মৃত্যু-অনুগামী ;
যাঁর কৃপাবলে, গ্রহগণ চলে,
রবি শশী দেয় কর,
জীবের জীবন রাখিতে পবন
সঞ্চরিছে নিরন্তর ;
যাঁর অনুমতি- ক্রমে বসুমতী
জীবগণে ধরি বুকে,
জননীর মত স্নেহে অবিরত
আহার দিতেছে সুখে ;
পালাক্রমে ছয় ঋতুর উদয়,
আজ্ঞায় অবনী'পরে ;
পদার্থ সকল, যাঁহার কৌশল,
অবিরল ব্যক্ত করে ;
ন্যায়বান্ ভূপ, যাঁহার স্বরূপ
কে বা কোথা আছে আর !

নিয়ম-নিচয় মঙ্গল-আলয়
সবসুখ-মূলাধার !
দীন ধনবান্ যাঁহার কল্যাণ
সম অধিকারী পেতে,
কলুষকলাপ করিতে আলাপ
নিকটে পারে না যেতে ;
তাঁর প্রতি মন করিয়া অর্পণ
সদা কাল হর সবে ;
দুঃখ দূরে যাবে, মনে সুখ পাবে,
সদা নিরাতঙ্কে রবে।

৺দ্বারকানাথ অধিকারী।

প্রশ্ন।

১। এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর।

২। সঞ্চরিছে, কলুষকলাপ, নিরাতঙ্ক, কল্যাণ, অবনী, বসুমতী, অনুগামী,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৩। দয়ার সাগর, তাঁর প্রতি, মঙ্গলের আলয়,—এইগুলির প্রত্যেকের অর্থ এক একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ কর।

প্রভাত।

রাত্ পোহাল, ফর্সা হ'ল
ফুট্‌ল কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা
জুট্‌ল অলিকুল॥

পূর্ব্বভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌ল দিবাকর।
সোণার বরণ তরুণ তপন
দেখ্‌তে মনোহর॥
ঘরের চালে পালে পালে
ডাক্‌ছে কত কাক,
পূজা-বাটীতে জোড়-কাঠিতে
বাজ্‌ছে যেন ঢাক॥
কত কুমারী সারি সারি
ছুল্‌ছে কাণে ছুল,
কানন হ'তে কচুর পাতে
আন্‌ছে তুলে ফুল॥
পান্তা খেয়ে শান্ত হ'য়ে
কাপড় দিয়ে গায়,
গরু চরাতে পাঁচন হাতে
রাখাল গেয়ে যায়॥
তাড়ি বগলে ছেলের দলে
পাঠশালাতে যায়।
পথে যেতে কোঁচড় হ'তে
খাবার নিয়ে খায়॥
এই বেলা সকাল বেলা
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে আনন্দেতে
থাক্‌বে যাতুধন॥

৺দীনবন্ধু মিত্র।

প্রশ্ন।

১। এই কবিতায় যে প্রভাত-বর্ণনা আছে, তাহা নিজের ভাষায় গদ্যে বল।

২। "নীল পতাকা"র অর্থ কি? এখানে কাহাকে নীল পতাকা বলা হইতেছে?

৩। এই কবিতার শেষ চারি ছত্র গদ্যে পরিবর্ত্তিত কর।

গোচারণের মাঠ।

রাখাল গো-পাল লয়ে গোচারণে যায়,
হাতেতে পাঁচন-বাড়ি, টোকাটি মাথায়;
মাল-কোঁচা কটি-তটে, কোঁচড়েতে চা'ল,
"ধেই ধেই" করি' গরু করিছে সামাল।
শামলী ধবলী রাঙী কেমন দেখায়,
খুঁটি খুঁটি ঘাস খায়, গুটি গুটি যায়;
এক পা দুই পা যায় মাছি লাগে গায়,
শিঙ্ ঝাড়ে মাথা নাড়ে, লাঙ্গুল দোলায়।
বার বার আপনার শরীর কাঁপায়,
বসিতে না পারে মাছি উড়িয়া বেড়ায়।
ডাইনে বামেতে ফিরে, সোজা নাহি চলে,
নূতন নূতন ঘাস খায় দুই কলে।

কুটি-কাটি নাহি মাঠে, অতি নিরমল,
নীহারে ভিজান তৃণ, সুচারু শ্যামল ;
কাঁথার মতন পুরু, কেমন কোমল,
তূলার তোষকে যেন ঢাকা মখমল !
তরুণ তপন আভা খেলে তদুপরি,
চক্ চক্ করে মাঠ যেদিকে নেহারি।
দেখিতে দেখিতে রবি গগনে উঠিল,
দেখিতে দেখিতে মাঠ ঝকিতে লাগিল।
তরুরে তাড়না করি' বায়ু যায় চলি,
শাখীর কোলেতে পাখী করিল কাকলী।
সরোবরে তর তর করে নীল জল,
কাঁপিল কমল-পাতা, কলমীর দল।
পুকুরের পাড় ছাড়ি চলিল গো-পাল,
বটতলা পিছে ফেলি ধরিল জাঙাল।
রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বট-তরু ঘিরে,
গোচারণ-মাঠে গাভী চরে ধীরে ধীরে।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

প্রশ্ন।

১। এই কবিতায় কবি গরুর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। ঝকিতে লাগিল, নিরমল, নেহারি, কাকলী,—এইগুলির অর্থ কি ?

৩। শাখী শব্দের অর্থ কত রকম হয় ? এখানে কোন্ অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ?

পরোপকার।

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল ;
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান ;
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত ;
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে।

৺রজনীকান্ত সেন।

প্রশ্ন।

১। "সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে"—ইহার অর্থ সরল ভাষায় বল।

২। জলধর, মোহিত,—এই দুইটি শব্দের অর্থ কি ?

৩। পরোপকার করা কেন ভাল, তাহা বুঝাইয়া বল।

খলতা।

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার,
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার।
কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়,
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়।

ধরাতলে নরাধম খল আছে যত,
ঠিক তারা উই আর ইঁদুরের মত !
কোনরূপে আপনার ইষ্টলাভ নাই,
কিসে কার মন্দ হবে খোঁজে শুধু তাই।
সূচের সুগুণ দেখ নয়ন ভরিয়া,
ছেঁড়া বাস জোড়া দেয় সেলাই করিয়া।
কোন খানে ফাঁক আর নাহি দেখা যায়,
একেবারে করে তারে নূতনের প্রায়।
আর দেখ আপনি অনলে হ'য়ে পোড়া,
সোহাগা কেমন সব ভাঙ্গা দেয় যোড়া।
যত দেখ অলঙ্কার, ধাতুর বাসন,
সোহাগায় হইতেছে সবার গঠন।
এইরূপ সদাশয় সাধু লোক যাঁরা,
সূচ আর সোহাগার মত হন তাঁরা,
পরের অনিষ্ট হেতু নাহি দেন মন,
কেবল করেন সদা কুশলসাধন।
আপনার অপকার স্বীকার করিয়া,
করেন অন্যের ভাল হিত আচরিয়া।
সুজন হইতে যার মনে সাধ আছে,
শিখুক সে নীতি, সূচ সোহাগার কাছে।
সূচ আর সোহাগার ভাব যেন লয়,
উই আর ইঁদুরের মত নাহি হয়।

প্রশ্ন।

১। উই আর ইঁদুরের ব্যবহারের সঙ্গে খল ব্যক্তির ব্যবহারের তুলনা কর।

২। সূচ ও সোহাগার গুণ বর্ণন কর। সাধু ব্যক্তিকে কেন সূচ ও সোহাগার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে?

৩। এই কবিতার শেষ দুই ছত্রের অর্থ কি?

জননী।

কে তোমায় করেছেন জঠরে ধারণ?
কে তোমায় করিছেন লালন-পালন?
মানুষ হয়েছ কার করি স্তন্যপান?
কে তোমার সুখে সুখী, দুঃখে হতমান?
তোমার হইলে রোগ কার রোগ-জ্ঞান?
তোমার আরোগ্যে কার প্রফুল্ল বয়ান?
তোমার লাগিলে ক্ষুধা কে হন কাতর?
তোমার তৃপ্তিতে কার সুতৃপ্ত অন্তর?
কে তোমার হিতকামী দিবস-রজনী?
তোমার জননী—তিনি তোমার জননী।

প্রশ্ন।

১। মাতা সন্তানের জন্য কি কি করেন বল।

২। প্রফুল্ল, হিতকামী, হতমান, জঠর, লালন-পালন,—এই শব্দগুলির অর্থ লিখ।

৩। এই কবিতাটি পুস্তক না দেখিয়া আবৃত্তি কর।

সুখদুঃখ।

(সুখ)

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নান-যাত্রার মেলা !
সকাল থেকে বাদল হ'ল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুসি, যতই আশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়—
ঐ মেয়েটির হাসি ;
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশী !
বাজে বাঁশী, পাতার বাঁশী
আনন্দস্বরে,
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

(দুঃখ)

ঠাকুরবাড়ী ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি' ;
একটি রাঙ্গা লাঠি কিন্‌বে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ :
হাজার লোকের মেলাটিকে
করেছে করুণ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন।

১। এই কবিতায় কবি যে সুখ ও দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সহজ ভাষায় বল।

২। অবিশ্রান্ত, বৃষ্টি-ধারা, নিমেষহারা, হংসধ্বনি,—এইগুলির অর্থ লিখ।

৩। আনন্দস্বর,—ইহার সমাস-বাক্য লিখ।

৪। "চেয়ে আছে নিমেষহারা নয়ন অরুণ"—ইহার অর্থ কি ?

পরিচ্ছদের গর্ব্ব।

হে ধনিন্! বৃথা তুমি হ'তেছ গর্ব্বিত,
বহুমূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত।

বসন-ভূষণে হ'য়ে শোভিত সুন্দর,
অভিমান কর যদি ওহে ধনেশ্বর,
তা হ'লে এই যে শিখী করিছে নর্ত্তন
প্রসারিয়া পুচ্ছ,—কর কর বিলোকন—
কেমন বিচিত্র উহা ! তব পরিচ্ছদ
ওর কাছে নহে কিছু শোভার আস্পদ !
প্রজাপতি-আদি কত পত পতঙ্গম,
তোমা হ'তে পরিচ্ছদ পরে মনোরম—
বিশ্ব-শিল্পি-রচিত—এমন সাধ্য কার
অবনীতে পরিচ্ছদ গড়ে এপ্রকার ?
সজ্জিত হইয়া তুমি সুন্দর সজ্জায়,
অহঙ্কার কর বৃথা, শোভা নাহি পায় !
মহামূল্য পরিচ্ছদ, বসন ভূষণ,
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্দ্ধন।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম্ম-অলঙ্কার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব-বিস্তার।

৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

প্রশ্ন

১। ধনী, নদী, মহাত্মা, সুখী,—এই শব্দগুলির সম্বোধনে কি হইবে ?

২। পরিচ্ছদ, পুচ্ছ, বিলোকন, আস্পদ, ভূষণ,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৩। "জ্ঞান-পরিচ্ছদ"—শব্দের অর্থ কি ?

৪। পরিচ্ছদের গর্ব্ব কেন ভাল নয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

বড় কে ?

আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে যে বড় হয় বড় গুণ তা'র।
হিতাহিত না জানিয়া মরে অহঙ্কারে,
নিজে বড় হ'তে চায়—ছোট বলি তা'রে।
গুণেতে হইলে বড়, বড় ক'বে সবে,
যদি বড় হ'তে চাও ছোট হও তবে।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রশ্ন।

১। বড় লোকের লক্ষণ কি ? কাহাকে ছোট লোক বলে ?

২। "হিতাহিত" শব্দের অর্থ কি ? ইহাতে যে সন্ধি আছে তাহা বিচ্ছেদ কর।

৩। "যদি বড় হ'তে চাও ছোট হও তবে"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য নিজের ভাষায় বল।

৪। সংসারে বড় হওয়া কঠিন ব্যাপার কেন ?

বিদ্যা।

জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন।
চোরে না লইতে পারে করিয়া হরণ ॥
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন।
এর তরে লোকে বলে বিদ্যা মহাধন ॥
বিদ্যা করে মানুষের মূর্খতা ভঞ্জন।
বিদ্যা করে মানুষের হৃদয় রঞ্জন ॥
বিদ্যা করে মানুষের বিপদ্ উদ্ধার।
বিদ্যা করে মানুষের সুখ্যাতি বিস্তার ॥
বিদ্যা করে মানুষে সুশীল ধনবান্।
বিদ্যাবলে মানুষের বাড়ে গুণ-জ্ঞান ॥
পৃথিবীতে কোন কার্য্য না দেখি এমন,
বিদ্যাবলে নাহি পারে করিতে সাধন ॥
তাই বলি লভিবারে বিদ্যা মহাধন,
কর প্রাণপণ সবে কর প্রাণপণ ॥

৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

প্রশ্ন।

১। বিদ্যার গুণ নিজের ভাষায় লিখ।

২। "মহাধন" এই শব্দটিকে বিচ্ছেদ কর এবং "মহা" শব্দ আগে বসাইয়া চারিটি শব্দ গঠন কর।

৩। বণ্টন, রঞ্জন, ভঞ্জন, প্রাণপণ,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৪। বিপৎ+উদ্ধার,—সন্ধি করিলে কি হইবে? এই সন্ধির সূত্র বল।

প্রার্থনা।

না মাগি সুন্দর কায়, অর্থে মন নাহি ধায়,
ভোগ-সুখে চিত রত নহে।
ঈশ্বর এ বর দিন্, 'সুস্থ থাকি চিরদিন,
যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে।'
ব্যাধিহীন কলেবর, শুদ্ধমতি নিরন্তর,
হলে আর অভাব কি আছে?
সুখেতে সময় যাবে, ধনী কি এ সুখ পাবে
চিন্তা, ভয়, সদা যার কাছে?

৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন।

১। এই কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। মাগি, কায়, চিত্ত, রহে,—এই শব্দগুলির অর্থ কি?

৩। অর্থ, শুদ্ধমতি, অভাব, ধনী,—এই শব্দগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দ কি?

গদ্য ও পদ্য

দ্বিতীয়ার্দ্ধ

কুণাল।

(বৌদ্ধ-আখ্যায়িকা)

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। প্রথমে তিনি মগধের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু শেষে উত্তর ভারতের অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের ভিতরে আসিয়াছিল। শেষ জীবনে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। সাধারণের সুচিকিৎসার জন্য আজকাল গ্রামে ও নগরে যেমন রাজব্যয়ে শত শত চিকিৎসালয় আছে, মহারাজ অশোক তাঁহার রাজ্যে সেইপ্রকার অনেক চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে বিদেশে প্রেরণ করিতেন এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও পাহাড়ের গায়ে উপদেশ উৎকীর্ণ করাইতেন। অশোকের সুশাসনে প্রজারা পরম সুখে থাকিত।

মহারাজ অশোকের কুণাল নামে এক গুণবান্ পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার মতই গুণবান্ ছিলেন। অশোক ভাবিয়াছিলেন, কুণাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজ্যের সুখৈশ্বর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে। মানব যাহা আশা করে, তাহা সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। কুণাল হইতে মহারাজ অশোক যে সৌভাগ্যের আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয় নাই।

কুণালের এক বিমাতা ছিলেন। তিনি সপত্নী-পুত্রকে গুণবান্ হইতে দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা হইলেন এবং যাহাতে কুণাল ভবিষ্যতে মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত না হন, তজ্জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে কুণালের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ অশোকের কর্ণগোচর হইতে লাগিল, কিন্তু পুত্রের প্রতি তাঁহার মনে একটুও সন্দেহ বা বিরক্তি জন্মিল না। বার বার ব্যর্থমনোরথ হইয়া কুণালের প্রতি মহিষীর ঈর্ষ্যা বাড়িয়া চলিল এবং যে প্রকারে হউক কুণালকে অপদস্থ করা তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

ক্রূরমতি মহিষীর পাপ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখা দিল। তক্ষশিলা নগর অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; হঠাৎ সেখানে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অশোক কুণালকে বিদ্রোহ-দমনের জন্য প্রেরণ

করিলেন। কুণাল অল্পদিনের মধ্যেই তক্ষশিলায় শান্তিস্থাপন করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে মহারাজ অশোক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মহিষী হতাশ না হইয়া অবিরাম অশোকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শুশ্রূষার গুণে অশোকের ব্যাধি দূর হইল এবং সমস্ত রাজ্য আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহিষীর সেবায় অশোক পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার-প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহিষী এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না; কিপ্রকারে তিনি কুণালের অনিষ্ট সাধন করিবেন এই চিন্তা তখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ছিল। তিনি মূল্যবান্ আভরণ বা হীরকহার প্রার্থনা করিলেন না, কেবল সপ্তাহকালের জন্য অশোকের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা হইল। পত্নীর এই প্রার্থনা অশোক পূর্ণ করিলেন;—মহিষী সপ্তাহকালের জন্য দেশের প্রধানা শাসনকর্ত্রী হইলেন।

শাসনভার গ্রহণ করিয়া কুণালের সর্ব্বনাশ করা মহিষীর প্রথম কর্ত্তব্য হইল। কুণাল তখনও তক্ষশিলায় বাস করিতেছিলেন। মহিষী গোপনে তক্ষশিলার

প্রধান কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন, যেন তিনি কুণালের দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। মহিষীই তখন অশোকের সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্রী, কাজেই এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহসী হইল না। রাক্ষসী রাণীর নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালিত হইল। সৌম্য রাজপুত্র কুণাল অন্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত তক্ষশিলার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশান্তরে ভগবান্ বুদ্ধের মহিমা গান করিতে লাগিলেন। পাপীয়সী রাণীর চক্রান্তে জীবনসর্ব্বস্ব পুত্র ও পুত্রবধূর কি দুর্দ্দশা হইল, সে সংবাদ সুদূর পাটলিপুত্রে মহারাজ অশোক জানিতে পারিলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। কুণাল বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবশেষে পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলেন। দিব্যকান্তি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নগরবাসিগণ মোহিত হইল। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে কুণাল ও কুণালের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিল না। তরুণ ভিক্ষুদম্পতীর আগমনবার্ত্তা মহারাজ অশোকের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে প্রাসাদে আহ্বান করিলেন। কুণাল রাজাদেশ অবহেলা করিতে পারিলেন না;—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাকে পত্নীসহ রাজার নিকটে উপস্থিত হইতে হইল।

প্রথম দর্শনেই অশোক তাঁহাদিগকে আপন পুত্র ও পুত্রবধূ বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া অবিরাম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কুণাল পিতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন এবং নির্ব্বাসন প্রভৃতির সকল কথাই নিবেদন করিলেন।

অশোক সকলই বুঝিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিষ্ঠুরা মহিষীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু কোমলহৃদয় কুণাল এই কঠোর দণ্ড প্রতিপালিত হইতে দিলেন না; তিনি পিতার চরণযুগল ধারণ করিয়া বিমাতার জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কুণালের প্রার্থনায় মহিষীর জীবনরক্ষা হইল; কিন্তু সেই দিন তাঁহার হৃদয়ে যে অনুতাপ হইল, তাহা জীবনে লোপ পাইল না। কথিত আছে, এই ঘটনার অল্পদিন পরেই অশোক এবং তাঁহার সেই মহিষী ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া পাটলিপুত্র নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন।

১। মগধ ভারতবর্ষের কোন্ অংশকে বলে?

২। "অধিপতি" অর্থ কি? এই শব্দের তিনটি প্রতিশব্দ দাও।

৩। "অধি" এই উপসর্গ দিয়া নিষ্পন্ন তিনটি শব্দ রচনা কর।

৪। উৎকীর্ণ, সৌভাগ্য, ঈর্ষ্যা, সাম্রাজ্য, ভিক্ষু,—এই শব্দ কয়টির অর্থ বল।

৫। কুণালের গল্পটি সহজ ভাষায় নিজে লিখ।

৬। সুখৈশ্বর্য্য, চক্ষুরুৎপাটন, রাজাদেশ,—এই কয়েকটি শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

৭। "অশোক" কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানা আছে বল।

রঘুনাথ শিরোমণি।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে রঘুনাথের জন্ম হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। দুঃখিনী মাতা অন্য উপায় না দেখিয়া নবদ্বীপের মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গৃহে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, ইহাতে শিশুপুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

শুনা যায়, রঘুনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে একটি সামান্য ঘটনায় তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলে অবাক্ হইয়াছিল। একদা

রঘুনাথ মাতার আদেশে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর পাকশালা হইতে আগুন আনিতে গিয়াছিলেন। তখন পাকশালায় ছাত্রগণ রন্ধন করিতেছিল। আগুনের জন্য কোন পাত্র রঘুনাথের হাতে নাই দেখিয়া, কোন ছাত্র উপহাস করিয়া তাঁহার হাতে এক হাতা জ্বলন্ত কয়লা দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বালক রঘুনাথ ইহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না, তাড়াতাড়ি এক অঞ্জলি ধূলা লইয়া তাহার উপরে আগুন লইতে প্রস্তুত হইলেন। বালকের এই অত্যাশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় বুঝিলেন, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, এই বালক কালে নিশ্চয়ই সুপণ্ডিত হইবে। এই ভাবিয়া সার্ব্বভৌম নিজের চতুষ্পাঠীতে রঘুনাথের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রঘুনাথ আজন্ম একচক্ষুহীন ছিলেন, এই কারণে ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে লোকে "কাণা রঘুনাথ" বলিয়া ডাকিত।

পাঠশালাতেও অধ্যাপকগণ রঘুনাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি বর্ণমালার অভ্যাসকালেই নানা কঠিন কঠিন প্রশ্ন অধ্যাপক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন।

রঘুনাথ বিদ্যারম্ভের পরে অতি-অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন

এবং শেষে স্মৃতি-শাস্ত্র পড়িয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে মিথিলা ব্যতীত অপর কোন স্থানে ন্যায়ের চর্চ্চা হইত না; সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বয়ং মিথিলায় গিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সার্ব্বভৌম মহাশয় নবদ্বীপের প্রথম নৈয়ায়িক অধ্যাপক এবং রঘুনাথ তাঁহারই উপযুক্ত ছাত্র হইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, যদি রঘুনাথকে মিথিলায় প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে এই রঘুনাথই নবদ্বীপে ন্যায়-চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। রঘুনাথের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অভিপ্রায় জানিয়া তিনি মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিতে গমন করিলেন।

এই সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শিক্ষাগুরু মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইয়া মিশ্রমহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকালে এরকম পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন যে, চতুষ্পাঠীর সকল ছাত্রই শাস্ত্রীয় তর্কে তাঁহার নিকটে পরাজিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং পক্ষধর মিশ্র মহাশয়ের সহিত রঘুনাথের বিচার আরম্ভ হইল এবং ইহাতে শিক্ষাগুরুই শিষ্যের নিকট

পরাজিত হইলেন। মিথিলার পণ্ডিতেরা বঙ্গদেশবাসী যুবকের এই কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

বিদেশী ছাত্রের এই কৃতিত্ব দেখিয়া মিথিলাবাসী ছাত্রগণ সন্তুষ্ট হন নাই। ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহারা প্রায়ই রঘুনাথের চক্ষুহীনতা লইয়া উপহাস করিতেন। কথিত আছে, একদা কয়েকটি মৈথিল ছাত্র একটি কবিতা রচনা করিয়া রঘুনাথকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ইন্দ্র সহস্রলোচনযুক্ত, শিব ত্রিলোচন, এতদ্ব্যতীত সকলেরই দুইটি করিয়া চক্ষু বর্ত্তমান, একচক্ষু তুমি কে?"

রঘুনাথ এ প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা রচনা করিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

মৈথিল ছাত্রগণকর্ত্তৃক রঘুনাথ প্রায়ই এই প্রকারে অযথা লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেন, কিন্তু অধ্যাপক মিশ্র মহাশয় দুষ্ট ছাত্রদিগকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতেন না। ইহাতে রঘুনাথের মনে দারুণ ক্ষোভের উদয় হইত। তিনি মনে করিতেন, তর্কে হারিয়া স্বয়ং মিশ্র মহাশয় ছাত্রদের সহিত যোগ দিয়াছেন। কথিত আছে, একদা রঘুনাথ ক্ষোভে ও ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া শিক্ষাগুরু মিশ্রমহাশয়ের উপরে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেইদিনই ঘটনাক্রমে গুরুমুখে নিজের প্রশংসার কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইয়াছিল। মনে মনে গুরুর প্রতি ক্রোধ করার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি

গুরুর পা ধরিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথের পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে মিশ্রমহাশয় পূর্ব্বেই মুগ্ধ ছিলেন, এখন তাঁহার বিনয় দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

পাঠ শেষ হইলে রঘুনাথ স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পক্ষধর মিশ্র মহাশয় রঘুনাথকে "তার্কিক শিরোমণি" উপাধি প্রদান করিলেন। নবদ্বীপে ফিরিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করা এবং ছাত্রবর্গকে ন্যায়ের উপাধি দেওয়া রঘুনাথের ইচ্ছা ছিল। এখন সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। নবদ্বীপে ফিরিয়া তিনি যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন, তাহাই বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রথম চতুষ্পাঠী হইল। এই সময় হইতে লোকে বাল্যের সেই দাসীপুত্র "কাণা রঘুনাথ"কে "কাণভট্ট শিরোমণি" নামে ডাকিতে লাগিল।

রঘুনাথের মৃত্যুর পর প্রায় চারিশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি বঙ্গদেশকে যে গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের একখানিও কালসহকারে লোপ পায় নাই। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, ছাত্রেরা বহুশ্রমে রঘুনাথের পুস্তক হাতে লিখিয়া পাঠ করিত। রঘুনাথ-বিরচিত পুস্তকগুলি ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠীতে আজও সমাদরে পড়ান হয়।

প্রশ্ন।

১। বাসুদেব সার্ব্বভৌম কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে তোমরা কি শিক্ষা করিয়াছ?

২। "প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব" কাহাকে বলে? রঘুনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কি উদাহরণ পাইয়াছ?

৩। পণ্ডিত, জ্ঞানী, দুঃখ, স্বদেশ, অপমান,—এ গুলির বিপরীত অর্থ-বোধক শব্দ কি?

৪। মিথিলা দেশ কোথায় ছিল? এখন সে দেশের নাম কি?

৫। "অধ্যবসায়" কাহাকে বলে? রঘুনাথের চরিত্রে অধ্যবসায় গুণ ছিল কি? কোন্ ঘটনায় তোমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছ?

৬। ত্রিলোচন, মৈথিল, ক্ষোভ, লাঞ্ছিত, সহধর্ম্মিণী, ভরণ-পোষণ, চতুষ্পাঠী, পশ্চাৎপদ,—এই শব্দগুলির অর্থ কি?

৭। শিরোমণি, চতুষ্পাঠী, দিগ্বিজয়ী,—এই কয়েকটি শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর এবং সন্ধির সূত্র বল।

৮। রঘুনাথ বঙ্গদেশকে কি প্রকারে গৌরব দিয়াছিলেন?

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়।

বিহার-প্রদেশ প্রাচীন কালে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। জরাসন্ধ-প্রভৃতি নরপতিদিগের রাজধানী বিহারেই ছিল। তাহার পরে অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজারা বিহার-অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তোমরা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম শুনিতে পাও, বিহার প্রদেশেই তাহার কেন্দ্র ছিল। আজও ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধদের অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে। পাটনা-জিলায় বড়গাঁও নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই স্থানটিতেই প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী, বহু আচার্য্য এবং বিদেশাগত শত শত ভ্রমণকারী এই স্থানে একত্র হইয়া যে এক সময়ে নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, নালন্দার এখনকার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। বিচিত্র শিল্পকার্য্যময় ইষ্টক-প্রস্তরে স্থানটি আচ্ছন্ন। ইহার চারিদিকে যে সকল পাথরের থাম ও মূর্ত্তি ছড়ান আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। বড়গাঁর চারিদিকে অনেকগুলি মাটির ঢিপি দেখা যায়, ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই সকল ঢিপির নীচে প্রাচীন মন্দিরাদি আছে।

চীন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান-গুলিতে ভ্রমণ করিয়া ভারতবাসিগণের সেই সময়কার আচার-ব্যবহার, শাসনতন্ত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাসাদির বিশেষ বৃত্তান্ত চীনা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর।

অতি-প্রাচীনকালে শিলাদিত্যনামক এক পরম-ধার্ম্মিক নৃপতি মগধে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই রাজত্বকালে নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বাসস্থান-নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়; কিন্তু তিনি এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী রাজাদের যত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে সেই নালন্দাই পরে মহানগরে পরিণত হইয়াছিল। ইহার নিকটে একটি অতি-প্রাচীন ও মনোরম আম্রকুঞ্জ এবং কয়েকটি বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। কথিত আছে, নালন্দা নগরের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব সেখানে আসিয়া কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

নালন্দায় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মিত হইলে, দেশবিদেশের ধার্ম্মিক ও ধনবান ব্যক্তিগণ সেখানে বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকদের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। পরে এই সকল বাসস্থানের চারিদিকে একটি উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার ছিল।

বিদেশীয় কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে যোগ্যতা-পরীক্ষার জন্য সুপণ্ডিত দ্বারপাল প্রবেশার্থীকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন। দশ জন প্রবেশার্থীর মধ্যে সাধারণতঃ দুই তিনজনের অধিক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত না।

নালন্দায় কি প্রকারে শিক্ষাদান করা হইত, ইৎ-সিংএর গ্রন্থে তাহাও অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রথমে ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্যাকরণ শেষ হইলে গদ্য ও পদ্যের পাঠ আরম্ভ হইত এবং সর্ব্বশেষে বুদ্ধের চরিত্র-বিষয়ক নানাবিধ আখ্যান ও তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল বিষয়ে যথার্থ শিক্ষালাভ হইলে ছাত্রেরা মহাবিদ্যালয়ে উচ্চতর বিষয়গুলি শিক্ষালাভ করিবার অধিকারী হইত। নালন্দায় কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত না; সেখানে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক ছাত্র রাজার কাছে গিয়া বিদ্যার পরিচয় দিত।

চীন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং যখন নালন্দায় আগমন করেন, তখন তিন হাজার ছাত্র সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত এবং শীলভদ্র, ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল-প্রমুখ ভুবনবিখ্যাত আচার্য্যগণ নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। সেই সময়ে প্রায় আড়াইশত গ্রামের কর নালন্দার জন্য

ব্যয়িত হইত। বর্ষা-ঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে ছাত্র ও আচার্য্যগণ গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের গাছের ছায়াতেই সকলে অধ্যয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রিপর্য্যন্ত সেখানে আচার্য্য, শিষ্য ও বিদেশী পণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনা চলিতে থাকিত।

উপাসনার জন্যও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। আচার্য্য ও ছাত্রগণ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে নীরবে বসিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুদ্ধের ধ্যান করিতেন। প্রতিদিনই বালক ও ভৃত্যবর্গ সুসজ্জিত পুষ্পপাত্র ও ধূপধূনা লইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং একজন আচার্য্য স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে ইহাদের পিছনে যাইতেন। আচার্য্যগণ শিষ্যদের নৈতিক উন্নতির জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাহারা আচার্য্যগণকে পিতৃস্থানীয় মনে করিত; আচার্য্যের পরিধেয় বস্ত্রাদি তাহারাই সুসজ্জিত রাখিত। প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার ভারও তাহাদের উপরে ছিল। আচার্য্যগণও শিষ্যদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কেহ পীড়িত হইলে অধ্যাপকেরাই তাহার শুশ্রূষা করিতেন। নালন্দার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর হইলেও আচার্য্য ও শিষ্যগণ সেই সকল নিয়ম পরমানন্দে পালন করিতেন। হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিচার নালন্দায় স্থান পাইত না।

প্রশ্ন।

১। কীর্ত্তি-চিহ্ন, পরিব্রাজক, আম্র-কুঞ্জ, বিশ্ববিদ্যালয়, পুষ্পপাত্র, প্রবেশার্থী, স্তোত্রপাঠ,—এই গুলির অর্থ বল।

২। "দেড় হাজার," "পিছন," "বেড়াইত," "গাছ," "সেই সময়," "চারিদিক্,"—এ চলিত কথাগুলিকে ভাল কথায় পরিবর্ত্তিত কর।

৩। নালন্দা কোথায় অবস্থিত? ইহা কেন বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে?

৪। নালন্দার ছাত্রেরা কি রকমে বাস করিত?

৫। "দ্বারপাল" কাহাকে বলে? "পাল" এই শব্দটির যত রকম অর্থ জান বল।

৬। "নীরব" এই শব্দটি বিশ্লেষ কর। নির্ এই উপসর্গ দিয়া নূতন চারিটি শব্দ রচনা কর।

৭। "হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিচার নালন্দায় স্থান পাইত না।" ইহার অর্থ সহজ ভাষায় বল।

৮। "পুষ্প" কথাটির একার্থ-বোধক যতগুলি শব্দ তোমার জানা আছে বল।

উই।

আকারে বৃহৎ হইলেই প্রাণিগণ বুদ্ধিমান হয় না। প্রাণীদিগের মধ্যে হস্তীর আকার অত্যন্ত বৃহৎ, কিন্তু তাহাদের আকারের অনুরূপ বুদ্ধি নাই। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত

হইলে কোনও কৌশলে আপনাদিগকে রক্ষা করে। কেবল এই সকল কার্য্যের জন্য যে একটু বুদ্ধির প্রয়োজন, হস্তীদিগের তাহাই আছে। হস্তীর তুলনায় মানুষ আকারে অনেক ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, মাটি চষিয়া শস্য উৎপাদন করে এবং নিজের সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্যও তাহারা অনেক কার্য্য করে। এই সকল কার্য্য হস্তীরা করিতে পারে না। বুদ্ধি অল্প বলিয়াই মহাকায় হস্তিগণ ক্ষুদ্র মানুষের বশীভূত থাকে। এই প্রবন্ধে যে প্রাণীদের বিষয় বর্ণিত হইবে, তাহারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহাদের বুদ্ধির কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে।

উই-পোকা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। গরম দেশের শুষ্ক স্থানে ইহারা বাস করে। আমাদের দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ক্ষুদ্র প্রাণী দেখা যায়। বাঁশ, কাঠ, শুষ্ক লতা, পাতা ইহাদের খাদ্য। যে সকল স্থানে উই অধিক বাস করে, সেখানে খাতাপত্র, মোজা, কাপড়, এমন কি জুতাপর্য্যন্ত তাহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করা কঠিন হয়। শুষ্ক বাঁশ বা কাঠ মাটিতে পোঁতা থাকিলে তাহারা আমাদের অগোচরে সেগুলির ভিতরে আশ্রয় লয় এবং তাহার সারভাগ খাইয়া ফেলে। তোমরা যদি উই-ধরা এক খানি বাঁশ ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে, উহার ভিতরে বহু সঙ্কীর্ণ পথ ও

ক্ষুদ্র কুঠারি মাটি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া অনেক উই-পোকা বাস করিতেছে।

যেখানে বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি খাদ্য পাওয়া যায় না, সেখানে উই-পোকারা মাটির নীচে আবাস-স্থান নির্ম্মাণ করে এবং দূর হইতে খাদ্য বহিয়া আনে। এই সকল আবাসের উপরে তাহারা মাটির ঢিপি করিয়া রাখে। তোমরা বল্মীক অর্থাৎ উইয়ের ঢিপি নিশ্চয়ই দেখিয়াছ; ইহাই উইদের আবাস। বৃষ্টির জলে বা রৌদ্রের তাপে যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার জন্যই উহারা বাসাগুলির উপরিভাগ শক্ত মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখে। আমাদের দেশে উইয়ের ঢিপি দুই বা তিন হাতের অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু আফ্রিকায় একজাতি উই দশ বারো হাত উচ্চ ঢিপি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।

উই অতিশয় আশ্চর্য্যজনক প্রাণী। ইহাদের দেহে ছয় খানি করিয়া পা থাকে, মুখের নিকটে দুইটি শুণ্ড বা দাঁড়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ অনুসন্ধান করিলে একটি চক্ষুও দেখা যায় না। ইহারা অন্ধ প্রাণী। যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃ অন্ধ তাহারা আলোকে আসিতে চায় না; উই-পোকাও আলোক ভালবাসে না। যখন দেওয়ালের বা মাটির উপর দিয়া গমনাগমনের প্রয়োজন হয়, তখন উহারা মৃত্তিকা দিয়া সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। মুখের

নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র দুইটি দাঁড়ার সাহায্যে উহারা মাটি কাটিয়া আনে এবং তাহা মুখের লালার সহিত

"ক"—উইয়ের রাণী। "খ"—পক্ষযুক্ত উই।
"গ"—উই। "ঘ"—ডিম্ব।

মিশাইয়া কর্দ্দম প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারাই তাহাদের যাতায়াতের সুরঙ্গ এবং বাসস্থানাদি নির্ম্মিত হয়।

যদি কখন উইয়ের ঢিপি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাও, তাহা হইলে তোমরা সেখানে ছোট এবং বড় এই দুইপ্রকার উই দেখিতে পাইবে। ছোট উইগুলিরই সংখ্যা অধিক; ইহারাই কর্ম্মী। বাসস্থাননির্ম্মাণ-প্রভৃতি কার্য্য ইহারাই করে। বড় উইগুলি সৈনিক বা প্রহরী। ইহাদের মস্তক দেহের তুলনায় যেন একটুকু বৃহৎ এবং সম্মুখের দাঁড়াগুলিও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ক্ষুদ্রকায় কর্ম্মী উইদিগের মধ্যে থাকিয়া পাহারা দেওয়াই ইহাদের প্রধান কার্য্য। বাহির হইতে কোন শত্রু আসিয়া অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, কর্ম্মীর দল নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তখন কেবল সৈনিকগণই তাহাদের দাঁড়া দিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে। ইহাঁদেরও চক্ষু নাই; কোথায় শত্রু আছে, তাহা ইহারা ঐ দুইটি শুঁয়োর সাহায্যে জানিয়া লইতে পারে। শত্রুকে চিনিয়া লইতে ইহাদের কখনই ভুল হয় না।

আমাদের গ্রামে ও নগরে কি প্রকারে নানা কার্য্য চলে তাহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। সেখানে কতকগুলি লোক লেখা-পড়ার কাজ করিয়া আফিস্ আদালত ও স্কুল-কলেজ চালায়, কতকগুলি লোক রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে এবং কতকগুলি লোক প্রহরীর কাজ করিয়া শান্তিরক্ষা করে। ক্ষুদ্র-

উইদের মধ্যে সেই প্রকার কর্ম্মবিভাগ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় না কি ?

উইয়ের ঢিপিগুলি যেন উইদিগের এক একটি ক্ষুদ্র নগর। তাহার ভিতরকার ব্যবস্থা বস্তুতই আশ্চর্য্যজনক। সমস্ত আবাস ছোট ছোট কুঠারিতে এবং সুরঙ্গের মত বহু পথে বিভক্ত থাকে। কুঠারিগুলিকে প্রায়ই শূন্য দেখা যায় না। কোন কুঠারিতে হাজার হাজার ডিম এবং কোন কুঠারিতে সদ্যোজাত বহু শিশু-উইদিগকে রাখিয়া কর্ম্মীর দল সৈনিকদিগকে তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত রাখে। সৈনিক উইয়েরা এমন সতর্কতার সহিত পাহারা দেয় যে, বাহির হইতে কোন শত্রু কুঠারিতে প্রবেশ করিয়া সহসা কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। পিপীলিকা বা অপর কোন পতঙ্গ আবাসে প্রবেশ করিলেই সৈনিক উইদের সহিত তাহাদের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং ইহাতে প্রায়ই উইয়েরা জয়লাভ করে।

কেবল সৈনিক ও কর্ম্মীর দল লইয়া উইদিগের নগর স্থাপিত হয় না। প্রত্যেক ঢিপিতে ইহাদের একটি রাজা ও একটি রাণী থাকে। আবাসস্থানের গভীরতম অংশের কোন কুঠারি রাজা ও রাণীর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। রাণী-উই দেখিতে অতি কদর্য্য ; সাধারণ উইদের তুলনায় রাণীর আকার প্রায় ত্রিশ হাজার গুণ বৃহৎ।

দেহে পা শুণ্ড প্রভৃতি সকল অঙ্গই থাকে, কিন্তু সেগুলি দেহের তুলনায় এত ক্ষুদ্র হইয়া জন্মে যে, তাহা সহসা নজরেই পতিত হয় না। প্রধানতঃ উদর লইয়াই ইহাদিগের দেহ। এই উদরে অসংখ্য ডিম্ব জন্মে এবং প্রতি মিনিটে ইহারা যাট্ হইতে সত্তরটা পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। রাজার দেহ রাণীর মত বৃহৎ না হইলেও, সাধারণ উইয়ের দেহের তুলনায় তাহা অনেক বড়। ভারী দেহ লইয়া রাজা ও রাণী আপনাদের প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিতে পারে না; এজন্য বহু কর্ম্মী এবং সৈনিক উই রাজা-রাণীর সেবায় নিযুক্ত থাকে। ডিম্ব প্রসব করা মাত্র, কর্ম্মিগণ সেগুলিকে অন্য কুঠারিতে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং ক্ষুধার সময়ে রাজা ও রাণীর সম্মুখে খাদ্য আনিয়া রাখে।

উপরে যে দুইটি প্রাণীকে উইদের রাজা ও রাণী বলা হইয়াছে, উহাদের ন্যায় অক্ষম ও অসহায় প্রাণী জগতে আর দেখা যায় না। তাহাদিগকে একই কুঠারিতে নির্জীব ভাবে যাবজ্জীবন থাকিতে হয়। রাজা-রাণীর পলায়নের আশঙ্কা করিয়া কর্ম্মী উইয়ের দল কুঠারির দ্বারগুলি কাদা দিয়া এমন ছোট করিয়া নির্ম্মাণ করে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলেও কখনই বাহিরে আসিতে পারে না। পক্ষী ও ভেকাদি বহু প্রাণী উইয়ের পরম শত্রু। ইহাদের অত্যাচারে প্রতিদিন হাজার হাজার

উই মারা পড়ে। উইয়ের রাণী অবিরাম ডিম্ব প্রসব করিয়া এই ক্ষয়ের পূরণ করে বলিয়াই তাহার এত আদর।

কর্ম্মী ও সৈনিক উইয়েরা আকারে রাজা-রাণী অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি রাজা এবং একটি রাণী কিপ্রকারে বৃহদাকার গ্রহণ করিয়া জন্মে, এই প্রশ্নটি বোধ হয় তোমাদের মনে উদিত হইতেছে। এসম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহা বড়ই অদ্ভুত। উইয়ের ঢিপির মধ্যে যে সকল ডিম থাকে, তাহা হইতে কেবল কর্ম্মী ও সৈনিক উই জন্ম গ্রহণ করে না ; ইহাদের সহিত অসংখ্য রাজা এবং রাণীও জন্মে। কর্ম্মী ও সৈনিকগণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আকারের অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু রাজা ও রাণীদিগের দেহ শীঘ্র বৃহৎ হইয়া পড়ে, এবং শেষে প্রত্যেকের দেহে দুইটি করিয়া চক্ষু এবং চারিখানি করিয়া ক্ষুদ্র ডানা গজাইয়া উঠে। ডানা উঠিলে রাজা-রাণীরা আর ঘরে থাকিতে চায় না, তখন দল বাঁধিয়া বাহিরে আইসে এবং উড়িতে আরম্ভ করে। কোন কোন দিন বৃষ্টির পরে যে অসংখ্য বাদল পোকাকে আকাশে উড়িতে দেখা যায়, ইহারাই সেই রাজা-রাণীর দল।

দেহে চারিখানি করিয়া ডানা থাকিলেও বড় বড় দেহ লইয়া রাজা-রাণীর দল অধিকক্ষণ আকাশে উড়িতে পারে না, কাজেই তাহাদিগকে মাটিতে নামিতে হয়

এবং নামিলেই তাহাদের ডানা ছিঁড়িয়া যায়। পক্ষী, পিপীলিকা, টিক্‌টিকি, ভেক ইহাদের পরম শত্রু। মাটিতে পড়িবামাত্র ঐ পোকাগুলিকে তাহারা উদরসাৎ করে। এই প্রকারে রাজা-রাণীদের অধিকাংশেরই জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়। কেবল যেগুলি দৈবাৎ কর্ম্মী উইদের সম্মুখে পড়ে, তাহাদের মধ্যে দুই চারিটি বাঁচিয়া যায়। এই সকল রাজা-রাণীর মধ্য হইতে কর্ম্মীর দল একটি রাজা এবং একটি রাণী মনোনীত করিয়া মাটীর নীচেকার ঘরে প্রবেশ করে এবং পরে উভয়কে একটি কুঠারিতে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হয়। এই প্রকারে ধৃত রাণীই কালক্রমে বড় হইয়া বহু অণ্ড প্রসব করিতে আরম্ভ করে।

স্থলে, জলে ও আকাশে যে কত প্রাণী নিয়ত বিচরণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। ঈশ্বর ইহাদের সকলকেই অল্পাধিক বুদ্ধিবৃত্তি দান করিয়াছেন ; কিন্তু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করার উপযোগী বুদ্ধি অতি অল্প প্রাণীই লাভ করিয়াছে। ক্ষুদ্রকায় উই-জাতি স্বভাবতঃ ঐরূপ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, প্রাণিজগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

প্রশ্ন।

১। "আকারে বৃহৎ হইলেই প্রাণিগণ বুদ্ধিমান হয় না।" এই কথাটির অর্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। উইয়েরা কি রকমে মাটির ঘরে বাস করে, লিখ।

৩। কর্ম্মী, পুরুষ, স্ত্রী এবং সৈনিক উইগুলিকে কি রকমে চেনা যায়?

৪। ডানাযুক্ত উই তোমরা দেখিয়াছ কি? সেগুলি কোন্ শ্রেণীর উই?

৫। উইয়েরা কি রকমে নিজেদের ঘর তৈয়ারি করে?

৬। প্রহরী, বল্মীক, কর্দ্দম, অবিরাম, জীবনলীলা, প্রাণি-জগৎ,—এগুলির অর্থ লিখ।

৭। উপযোগী, রাজা, নিকটবর্ত্তী, হস্তী, বৃক্ষ,—এইগুলি স্ত্রীলিঙ্গে কি হইবে?

৮। উইয়ের ঢিপি, বড়, পা, কুঠারি, হাজার, পোকা, মাটি,—এইগুলিকে ভাল কথায় তোমরা কি বলিবে?

পুণ্যাত্মা হোসেন্ শাহ

বঙ্গদেশ মোগলরাজগণের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে যে সকল স্বাধীন মুসলমান-রাজা বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দিন্ হোসেন শাহের নামই বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার ন্যায় উদার প্রজাবৎসল বিদ্বান্ ও জ্ঞানী নরপতি বোধ হয় গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হয়েন নাই। তাঁহার রাজত্ব সুদূর ত্রিপুরা এবং কামরূপ

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজও তাঁহার নামাঙ্কিত বহু কীর্ত্তি-চিহ্ন গৌড় ও মুরশিদাবাদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হোসেন্ শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

হোসেন্ রাজপুত্র বা ধনীর সন্তান ছিলেন না। কেবল নিজের চেষ্টায় তিনি রাজা হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়।

হোসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ বিখ্যাত "সৈয়দ্" বংশজাত; তাঁহারা আরব-দেশের অধিবাসী ছিলেন। সৈয়দ্গণ হজরৎ মহম্মদের বংশধর; এই কারণে লোকসমাজে তাঁহাদের প্রচুর সম্মান। হোসেনের পিতৃপিতামহদিগেরও আরবদেশে বহু সম্মান ছিল। তাঁহারা "সরিফী মক্কী" এই গৌরবময় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহারা হীনাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হোসেনের পিতা সৈয়দ্ আস্রফ্ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পুত্রের সহিত বঙ্গদেশের চাঁদপাড়া-নামক পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। চাঁদপাড়া এখন মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত এবং সাগরদীঘি-নামক রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইল না। সেই

সময়ে চাঁদপাড়ায় সুবুদ্ধি রায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ; হোসেন্ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এই ব্রাহ্মণের অধীনে একটি সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন। সুবুদ্ধি রায় তখন একটি দীর্ঘিকা খনন করাইতেছিলেন ; ইহারই তত্ত্বাবধান করা হোসেনের কার্য্য হইল। হোসেন্ অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং প্রভুকে খুসী রাখিবার জন্য প্রাণপণে শ্রম করিতেন ; কিন্তু তথাপি দরিদ্র হোসেনকে সুবুদ্ধি রায় অকারণে কষ্ট দিতেন। কথিত আছে, তিনি একদা হোসেনকে নির্ম্মমভাবে প্রহার পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। যখন গৌড়েশ্বর হইয়া হোসেন বঙ্গের স্বাধীন নরপতি হইয়াছিলেন, তখনও সেই আঘাতের চিহ্ন তাঁহার অঙ্গে দেখা যাইত।

যাহা হউক, কোপন-স্বভাব সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে হোসনকে অধিক কাল কার্য্য করিতে হয় নাই। চাঁদ-পাড়ায় একজন কাজী বাস করিতেন। তাঁহারই কন্যার সহিত হোসেনের বিবাহ হইয়া গেল ; তিনি কাজীর নিকটে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মুজাফর্ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কাজী সাহেব রাজকার্য্যের উপলক্ষ্যে রাজধানীতে যাইতেন। তাঁহার চেষ্টায় জামাতা হোসেন্ গৌড়-দরবারে একটি সামান্য পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতেই হোসেনের উন্নতি হইতে লাগিল। কার্য্যদক্ষতা

ও বুদ্ধির বলে মুহুরীর পদ হইতে তিনি ক্রমে গৌড়েশ্বরের উজীরের পদ পাইলেন।

মুজাফর্ শাহকে লোকে ভালবাসিত না। তিনি তিন বৎসরমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প কালেই তাঁহার ভীষণ অত্যাচারে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবৃন্দ বিচলিত হইয়াছিল এবং রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিল। ইহার ফলে মুজাফর্ নিহত হইলেন এবং জনসাধারণের অনুরোধে "সুলতান্ আলাউদ্দিন" এই উপাধি গ্রহণ করিয়া হোসেন্ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই প্রকারে চাঁদপাড়ার সুবুদ্ধি রায়ের সেই লাঞ্ছিত ভৃত্য কার্য্যদক্ষতার গুণে বঙ্গের স্বাধীন অধীশ্বর হইলেন।

হোসেন্ শাহের হৃদয়ে কোনপ্রকার ক্ষুদ্রতা স্থান পাইত না। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি সুবুদ্ধি রায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা মনে স্থান দেন নাই। বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হোসেন্ শাহ সমগ্র চাঁদপাড়া গ্রাম সুবুদ্ধিকে নিষ্কররূপে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুবুদ্ধি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অগত্যা গ্রামখানির কর এক আনামাত্র নির্দ্দেশ করিয়া হোসেন্ শাহ সুবুদ্ধি রায়কে সম্মানিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রাম "এক আনা চাঁদপাড়া" নামে খ্যাত রহিয়াছে।
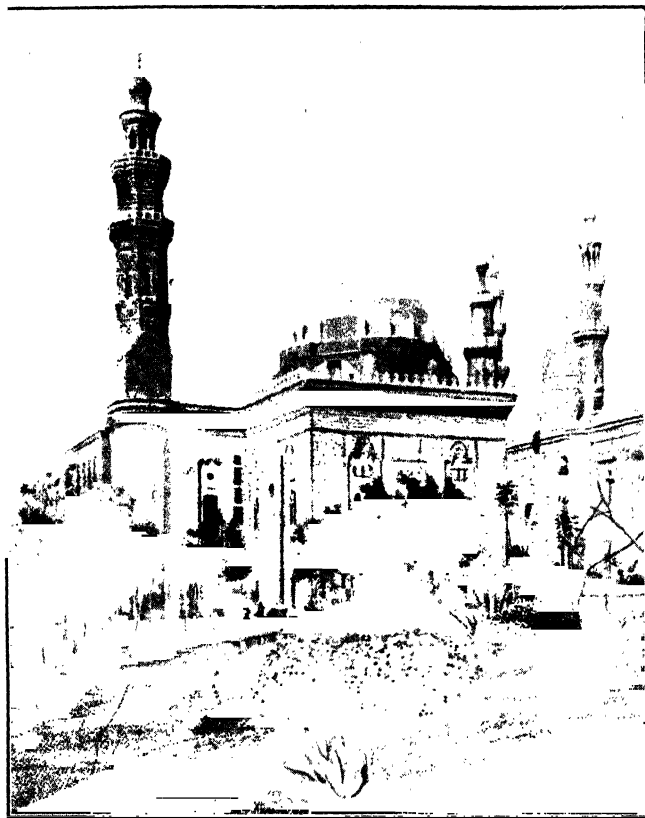
একটি প্রাচীন মসজিদ্ ।

হোসেন্ শাহের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আবিসিনিয়া-দেশবাসী একদল হাব্সী ক্রীতদাস সৈনিকপদ গ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিত। ইহারা প্রথমে রাজ্যশাসনের প্রকৃত সহায় ছিল, কিন্তু পরে ইহাদেরই যথেচ্ছাচারে ও প্রভুত্বে স্বয়ং রাজাও ভয় পাইতেন। সিংহাসনপ্রাপ্তির পরে হাব্সী-সেনাদলকে নির্ব্বাসিত করা হোসেন শাহের প্রথমকার্য্য হইয়াছিল। রাজ্যের এই কণ্টক দূর হইলে গৌড় শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। দূরদেশ হইতে মোগল, সৈয়দ, আফগান্ প্রভৃতি উচ্চবংশের মুসলমানগণ আসিয়া গুণগ্রাহী হোসেন্ শাহের অধীনে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। এই প্রকারে বঙ্গের রাজধানী বিদ্যা, জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল।

দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে সৈন্য সমাবেশ করিয়া হোসেন শাহ আসাম জয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যেও ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না ছিলেন। কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ হোসেনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

হোসেন শাহের শাসনকাল গৌড়ীয় ইতিহাসের কল্যাণের যুগ বলা যাইতে পারে। তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য বঙ্গদেশে শত শত মস্জিদ্ ও চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং প্রজাগণের জলকষ্ট

হইলেই নগরে, গ্রামে ও পথিপার্শ্বে জলাশয়াদি খনন করাইয়া দিতেন। পরমধার্ম্মিক হোসেন্ শাহ আরব-দেশের মদিনা-নগর হইতে হজ্‌রৎ মহম্মদের "কদম্ রসুল্" অর্থাৎ শিলাময় পাদপদ্ম আনিয়া তাহা গৌড়ের একটি সুন্দর মস্‌জিদে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মস্‌জিদ্ এখন ভগ্নদশাপন্ন। তদ্‌ভিন্ন তাঁহার নির্ম্মিত যে কত সুদৃঢ় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আজও দণ্ডায়মান আছে, তাহা গণনা করা যায় না। যে মুরশিদাবাদ জেলায় হোসেন জীবনের প্রথম অংশ যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। চাঁদপাড়ার নিকটবর্ত্তী "সেখের দীঘি" নামক বৃহৎ জলাশয় এবং জঙ্গীপুরের নিকটে "জীয়ৎ কুঁড়ি" নামক বৃহৎ পুষ্করিণী তিনিই খনন করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, গৌড় হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাজপথটি রহিয়াছে, তাহা হোসেন্ শাহেরই কীর্ত্তি।

হোসেন শাহ বঙ্গভাষার অকপট বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সভায় বিখ্যাত মৌলবী এবং পণ্ডিত একই ভাবে সমাদৃত হইতেন। সুবিখ্যাত রূপ, সনাতন ও পুরন্দর খাঁ প্রভৃতি হোসেন্ শাহের সভাসদ্ ছিলেন। ভাগবতের অনুবাদ-কর্ত্তা মালাধর বসুকে হোসেন্ শাহই "গুণরাজ খাঁ" এই গৌরবময় উপাধি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার লেখকদিগকে কি প্রকারে

উৎসাহ দিতেন, তাহা বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ,' ছুটি খাঁর 'অশ্বমেধ-পর্ব্ব' প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থপাঠে জানা যায়। যে গুণে মোগল-সম্রাট্ আকবর শাহ ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেইপ্রকার গুণেই হোসেন্ শাহ বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয় রহিয়াছেন। আকবরের নামাঙ্কিত মুদ্রা বঙ্গদেশের গৃহস্থগণ যেমন সৌভাগ্যচিহ্ন বলিয়া রক্ষা করেন, হোসেন্ শাহের মুদ্রাও অদ্যাপি অনেক প্রাচীন পরিবারে সেই প্রকার আদরে রাখা হয়।

১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হোসেন্ শাহ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি-মন্দির আজও গৌড়ে আছে। মানব শিলামৃত্তিকা দ্বারা যে স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করে, তাহা চিরস্থায়ী হয় না। হোসেনের সমাধিমন্দিরটি হয় ত কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে; কিন্তু বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস হইতে তাঁহার পুণ্য নাম কখনই লোপ পাইবে না।

প্রশ্ন।

১। "রাজ্য" ও "রাজত্ব" এই দুইটি শব্দের অর্থ কি? প্রত্যেকটি ব্যবহার করিয়া এক একটি পদ রচনা কর।

২। হোসেন শাহের বাল্য জীবন নিজের ভাষায় লিখ।

৩। গৌড় কোথায়? এখন তাহা কোন্ জিলার অন্তর্গত?

৪। সুবুদ্ধি রায় কে ছিলেন? হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন?

৫। "গ্রাসাচ্ছাদন" কথাটির শব্দগত অর্থ কি? দীর্ঘিকা কাহাকে বলে। "পুষ্করিণী" ও "দীর্ঘিকার" মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

৬। হীনাবস্থাপন্ন, অধীশ্বর,—এই দুইটি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া সন্ধির সূত্র দুইটি বল।

৭। "হোসেন শাহ বঙ্গভাষার অকপট বন্ধু ছিলেন।" উদাহরণ দিয়া এই কথার সার্থকতা প্রমাণ কর।

বঙ্গের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র।

ভারতে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ সময়ে বঙ্গভাষার অবস্থা উন্নত ছিল না। আজকাল আমরা যে সকল উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিতেছি তখন তাহা পাওয়া যাইত না। মুদ্রাযন্ত্র ছিল, কিন্তু সেই সকল যন্ত্রে বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ছাপার অক্ষরে বাঙ্গলা পুস্তকের প্রচার হইত না। এখন বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তখন তাহাদের একখানিরও অস্তিত্ব ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যে সকল হৃদয়বান

ইংরেজ বঙ্গদেশে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই কয়েকজন প্রাণপণ চেষ্টায় বঙ্গভাষার উন্নতির পথ দেখাইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কেরী "দিগ্‌দর্শন" নামক প্রথম মাসিকপত্র বাঙ্গলায় প্রকাশ করেন এবং মহাপণ্ডিত মার্সমান্ সাহেবের চেষ্টায় প্রথম বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্র "সমাচার-দর্পণ" প্রকাশিত হয়। প্রথম বাঙ্গলা-ব্যাকরণও সুপণ্ডিত হ্যাল্‌হেড্ সাহেব রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। পুস্তক ও সংবাদ-পত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না; বাঙ্গলা অক্ষর খোদাই করিয়া পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থাও তাঁহাদিগকে করিতে হইত। হ্যাল্‌হেড্ সাহেব এবং তাঁহার বন্ধু উইল্‌কিন্স্ সাহেব বাঙ্গলা অক্ষরের খোদাই-কার্য্য খুব ভাল জানিতেন। আমরা এই পাঠে হ্যাল্‌হেড্ সাহেবের জীবনের পরিচয় দিব।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত বংশে হ্যাল্‌হেড্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কোন ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন। বাল্যকালেই হ্যাল্‌হেড্ নানাপ্রকারে তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; ইহা দেখিয়া বালকপুত্র যাহাতে লেখাপড়া শেখেন সে বিষয়ে পিতার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ক্রাইষ্ট্‌চার্চ্চ কলেজে পড়ার সময়ে সকলেই হ্যাল্‌হেডের অধ্যবসায়,

মহাত্মা কেরী

বিনয় ও সৌজন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। এই সময়েই উইলিয়ম্ জোন্‌সের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ঘটে। তখন সাধারণ ইংরেজগণ ভারতবর্ষের সংবাদ বিশেষ জানিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ যে একটি প্রাচীন সভ্য দেশ, তাহা জোন্‌স্ সাহেবের জানা ছিল। ভারতের সমস্ত বিবরণ অবগত হইবার জন্য তিনি সেই সময়ে আরবী ভাষায় লিখিত নানাগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি জোন্‌স্ সাহেবের শ্রদ্ধা দেখিয়া হ্যাল্‌হেড্ ভারতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ভারত-ভ্রমণের সঙ্কল্প এই সময়েই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

কলেজের শিক্ষা শেষ হইলে, হ্যাল্‌হেডের ভারতভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হইয়া পড়িল। তখন সুয়েজ-খাল খনন করা হয় নাই; যাত্রীদিগকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিতে হইত; আবার কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সহজে জাহাজে স্থান পাইতেন না। হ্যাল্‌হেড্ ভারতবর্ষে আসিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ভারতে নূতন কর্ম্মচারি-নিয়োগের প্রয়োজন হইয়াছিল। হ্যাল্‌হেড্ একটি পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন করিলেন এবং তাঁহার আবেদন সফল হইল। এইপ্রকারে সামান্য মুহুরীর

পদ গ্রহণ করিয়া তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র।

ভারতবর্ষে আসিয়া হ্যাল্‌হেড্ দেখিলেন, তিনি যে পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার কার্য্য শেষ করিতে প্রতিদিন অল্প সময়েরই প্রয়োজন হয়। হ্যাল্‌হেড্ অবকাশ বৃথা কাটাইতেন না ; আফিসের কার্য্য হইতে মুক্তি পাইলেই, তিনি ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতেন এবং সংস্কৃত ও বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেন। কিছুদিনের মধ্যে এই যুবকের উদ্যমের কথা ভারতের শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল। হেষ্টিংস হ্যাল্‌হেড্‌কে একটা বড় কাজে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে হ্যাল্‌হেড্ সাহেব মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবিদেশের ভাল পুস্তক না ছাপাইলে এ দেশের উন্নতি হইবে না। বঙ্গদেশস্থ সদাশয় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ হ্যাল্‌হেডের সহায় ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এবং হ্যাল্‌হেডের প্রাণপণ চেষ্টায় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল ; ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র।

চারি বৎসর বঙ্গদেশে বাস করিয়া হ্যাল্‌হেড্ যে একখানি বাঙ্গলা-ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, নূতন মুদ্রাযন্ত্রে তাহাই ছাপাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু

পদে পদে নানা বিঘ্ন দেখা দিল ; বহু চেষ্টাতেও বাঙ্গলা অক্ষর খোদাই করিবার জন্য লোক পাওয়া গেল না এবং পুস্তক ছাপাইবার উপযোগী কালিও সংগ্রহ করা
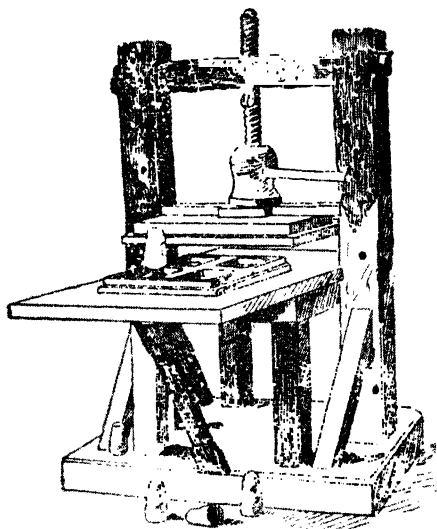
প্রথম মুদ্রাযন্ত্র।

গেল না। হ্যাল্‌হেডের বন্ধুদের মধ্যে চার্লস্‌ উইল্‌কিন্‌স্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। নানা শিল্পকার্য্য তাঁহার জানা ছিল। তিনি হ্যাল্‌হেডের সহায় হইলেন এবং নিজের হাতে বাঙ্গলা অক্ষর খোদাই করিতে লাগিলেন। সেই অক্ষরে এবং তাঁহারই প্রস্তুত কালিতে হ্যাল্‌হেড্‌-

প্রণীত বাঙ্গলা-ব্যাকরণ মুদ্রিত হইল। অক্ষর-খোদাইয়ের সময়ে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামে একজন ছাপাখানার কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালনায় ও অক্ষর-খোদাই-কার্য্যে পঞ্চানন পরে হ্যাল্‌হেড্ সাহেবকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। ক্যাক্সটন্ সাহেব ইংলণ্ডে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় মহাত্মা হ্যাল্‌হেড্ ও উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের নাম লোকে চিরকাল মনে রাখিবে।

হ্যাল্‌হেড্ সাহেব কেবল বাঙ্গলা-ব্যাকরণ রচনা করিয়াই বিরত হয়েন নাই। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, মহাভারতের ইংরাজী-অনুবাদ প্রভৃতি অনেক কাজে হাত দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি অনেক তুর্লভ হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেগুলি আজও ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে এবং তাঁহার ইংরাজী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

হ্যাল্‌হেড্ বার বৎসর বঙ্গদেশে থাকিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ গমন করেন। বঙ্গদেশ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অল্পদিন ইংলণ্ডে থাকিয়া আবার এ দেশে আসিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহা পূর্ণ হয় নাই। সংস্কৃতে এবং বঙ্গভাষায় তাঁহার

অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। শুনা যায়, তিনি যখন ধুতি-চাদর পরিয়া বাঙ্গলায় কথা বলিতেন তখন কেহই হ্যাল্‌হেড্‌ সাহেবকে ইংরেজ বলিয়া চিনিতে পারিত না। কয়েক বৎসরমাত্র ভারতবর্ষে থাকিয়া তিনি বঙ্গবাসীর উন্নতির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রশ্ন।

১। মুদ্রাযন্ত্র, পরিচয়, সম্ভ্রান্ত, অধ্যবসায়, অনুরক্ত, শ্রদ্ধা, সঙ্কল্প, কর্ণগোচর,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

২। প্রথম বাঙ্গলা মাসিক পত্রের এবং প্রথম সাপ্তাহিক পত্রের নাম কি ছিল? কত দিন পূর্ব্বে তাহা বাহির হইয়াছিল? আজকালকার কতকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের নাম বল।

৩। "পঞ্চানন কর্ম্মকার," "ক্যাক্সটন," "হেষ্টিংস," "উইল্‌কিন্‌স্‌,"—ইঁহাদের পরিচয় দাও।

৪। "উন্নতি" ইহার সন্ধি-বিচ্ছেদ কর। উক্ত শব্দে যে উপসর্গ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই উপসর্গ দিয়া চারিটি নূতন শব্দের গঠন কর।

৫। হৃদয়বান্‌, প্রার্থী, সহায়,—এই শব্দগুলির বিপরীত লিঙ্গের রূপ কি হইবে?

৬। মাস, সপ্তাহ, অধ্যবসায়, প্রচার,—এই বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত কর।

সারা মার্টিন।

ধনী যখন দরিদ্রকে ধন দান করেন, তখন তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু দরিদ্র যখন নিজের ভিক্ষান্নে অপরের অভাব মোচন করেন, তখন সেই দান অতুলনীয় মনে হয়। দরিদ্রের কন্যা সারা মার্টিন নিজেও অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। পরের উপকারে নিজের জীবন ও ভিক্ষার অর্থ দান করিয়া, তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার মাহাত্ম্য লোকে চিরকাল মনে রাখিবে। দরিদ্রের প্রতি দয়া করা যত সহজ, যাহারা সমাজে ঘৃণিত তাহাদের প্রতি দয়া করা সেপ্রকার সহজ নয়। কিন্তু সারা মার্টিন কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কারাবাসীদিগের দুঃখমোচন জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের এক ছোট নগরে এক দরিদ্র পরিবারে সারা মার্টিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যেই জনক-জননীকে হারাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ক্ষুদ্র বালিকা বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষা ব্যতীত অপর শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই। কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহার পিতা অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন

নাই। বালিকা সারা নিজের ভরণ-পোষণের জন্য সেলাইয়ের কাজ শিখিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ইহাতে এত পটুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনভাবে সেলাইয়ের কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন ; নিজের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহার আর চিন্তা রহিল না।

বালিকা সারাকে প্রতিবেশিগণ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। উনিশ বৎসর বয়সে একদিন তিনি কোন পাদ্রির নিকটে উপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন। পাদ্রির ধর্ম্মকথাগুলি তাঁহার হৃদয়কে এমন বিচলিত করিল যে, তিনি ধর্ম্মকর্ম্মকে জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন। সারা যেন এক নূতন জীবন লাভ করিলেন ; অক্ষম, রুগ্‌ণ এবং জরাগ্রস্ত নিঃসহায় নর-নারীর সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। যে সকল বালকবালিকা শিক্ষাভাবে চরিত্রহীন হইতেছিল, তাহাদের সুশিক্ষা দেওয়াও তাঁহার আর একটি কাজ হইল।

এই সময়ে য়ুরোপের কোন দেশেই জেলখানার অবস্থা ভাল ছিল না। অনেক স্থানেই ছোট ঘরে অনেক কয়েদীকে একত্র রাখা হইত এবং তাহাদের চরিত্রসংশোধনের জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই কারণে যে সকল কয়েদী খালাস পাইত তাহাদের

স্বাস্থ্য এবং চরিত্র উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অস্বাস্থ্যকর স্থানে অসৎসংসর্গে থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন ও চরিত্র দূষিত হইয়া পড়িত। কয়েদীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিশিক্ষা দিবার জন্য সারা স্থানীয় কারাধ্যক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কারাধ্যক্ষ আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন না, কিছুকাল পরে আবার নূতন করিয়া আবেদন করিলেন। রমণীর কাতর প্রার্থনা কারাধ্যক্ষ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না: সারা জেলখানায় যাইবার অনুমতি পাইলেন।

জেলখানায় গিয়া সারা দেখিলেন যে, তিনি এক ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। কয়েদীদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিত, কেহ মারিতে উদ্যত হইত এবং কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গালাগালি দিত। তিনি ইহাতে একটুও ভয় না পাইয়া তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে এই কয়েদীরাই সারার এত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে তাহারা সত্যই আনন্দিত হইত।

সারা প্রত্যেক রবিবারে জেলখানায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং প্রতিদিনই এক এক দল কয়েদীকে কোন শিল্প শিখাইতেন। খালাস পাইয়া তাহারা যাহাতে

কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইতে পারে, তাহারই জন্য শিল্পশিক্ষা দিবার উপরে সারার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ব্যবসায় করিতে গেলে প্রথমে কিছু মূলধনের প্রয়োজন। খালাস পাইয়া কয়েদীরা যাহাতে কিছু মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও সারাকে করিতে হইয়াছিল। তিনি কয়েদীদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং এই ভিক্ষার টাকা দিয়া কয়েদীরা ব্যবসায় আরম্ভ করিত।

কুড়ি বৎসর কারাবাসীদের মঙ্গলের জন্য শ্রম করিয়া সারার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং কঠিন পীড়া দেখা দিল। কিন্তু ইহাতেও তিনি কার্য্য ত্যাগ করিলেন না ; অসুস্থ শরীরে তিনি পূর্ব্ববৎ কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে পীড়া গুরুতর হইল এবং তিনি শয্যাশায়িনী হইলেন। এই শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হাজার হাজার লোককে কাঁদাইয়া দয়াবতী সারা মার্টিন পৃথিবীর নিকটে চিরবিদায় লইলেন। সারা মার্টিনের মত দয়াবতী রমণী প্রায়ই দেখা যায় না।

প্রশ্ন।

১। সারা মার্টিন কে ছিলেন ?

২। ধনী যে ধন বিতরণ করেন এবং দরিদ্র যে ভিক্ষার অন্ন বিতরণ করেন,—এই দুই দানের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রশংসা করা উচিত? কেন প্রশংসা করা উচিত তাহার কারণ উল্লেখ কর।

৩। 'কয়েদ,' 'কয়েদী',—এই দুইটি শব্দের ভাল প্রতিশব্দ বল।

৪। অস্বাস্থ্যকর, নীতিশিক্ষা, চরিত্র সংশোধন, ধর্ম্মকর্ম্ম, আবেদন, জাগ্রত,—এই গুলির অর্থ বল।

৫। সারা মার্টিনের চরিত্র সহজ ভাষায় বল।

৬। দরিদ্র, ধর্ম্ম, অসৎ, মঙ্গল, অন্ন, মুক্তি,—এই শব্দগুলির বিপরীত অর্থবোধক শব্দ রচনা কর।

৭। 'অর্থোপার্জ্জন,' 'শিক্ষাভাব,'—এই দুইটি শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

৮। দয়ার্দ্রতী, কারাবাসী, বালিকা, জননী, জরাগ্রস্ত,—এই শব্দগুলির প্রত্যেকটির লিঙ্গ পরিবর্ত্তন কর।

পিপীলিকা।

এই পাঠে তোমাদিগকে পিপীলিকার বিষয়ে কিছু বলিব। ইহারা মৌমাছি ও বোল্‌তার দলের প্রাণী, কিন্তু তাহাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান্। হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি বড় প্রাণীরা বুদ্ধি খরচ করিয়া যাহা করিতে না পারে পিপীলিকারা তাহা করে। এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণীই ইহাদের মত বুদ্ধিমান্ নয়।

পিপীলিকারা নিজের তৈয়ারি ঘরে দল বাঁধিয়া বাস করে, দলের উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে, নিজেদের ঘর বাড়ী ও ছেলেপিলেদের রক্ষা করিবার

জন্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। ইহাদের ভাষা নাই বটে, কিন্তু নানা রকমে মনের ভাব পরস্পরকে জানাইতে পারে। আমরা যেমন গোরু পুষিয়া তাহার দুধ খাই, ইহারাও তেমনি এক রকম পোকা পুষিয়া সেগুলির নিকট হইতে মিষ্ট খাদ্য আদায় করিয়া লয়। আবার দুই এক রকম পিপীলিকা আমাদের মত চাষ-আবাদও করে। ইহারা ঘাসের ছোট বীজ মুখে করিয়া বহিয়া আনে এবং তাহা বুনিয়া শস্য উৎপন্ন করে। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিতে পিপীলিকারা মানুষের চেয়ে খুব কম নয়।

ভাল আতসী-কাচ দিয়া দেখিলে পিপীলিকাকে যে-রকম দেখায় এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবিতে পিপীলিকার বুক ও লেজের জোড়ের জায়গায় বলের মত দুইটি পিণ্ড আছে। ইহা পিপীলিকার দেহের প্রধান চিহ্ন। কোনও কোনও পিপীলিকার দেহে ঐ-রকম একটি মাত্র পিণ্ড থাকে।

পিপীলিকা।

মৌমাছি ও বোল্‌তার মতই পিপীলিকাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ও কর্ম্মী এই তিন জাতি আছে। স্ত্রী ও কর্ম্মী
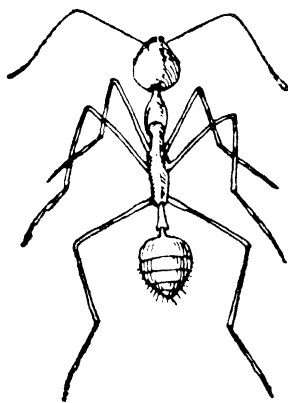
পিপীলিকার লেজের অংশটা প্রায়ই ছয় থাক্ আংটি জুড়িয়া প্রস্তুত হয়। পুরুষদের লেজে সাত থাক্ আংটি থাকে। কিন্তু ইহাদের সকলেরই ছয়খানা লম্বা পা এবং মাথায় একজোড়া শুঁয়ো থাকে। পিপীলিকার শুঁয়ো বোল্‌তা বা মৌমাছির শুঁয়োর মত নয়। আমাদের হাত ও পা যেমন কতকগুলি ছোট ও বড় খণ্ড খণ্ড অংশ জুড়িয়া প্রস্তুত, পিপীলিকার শুঁয়োও ঠিক সেই রকম দুইটি খণ্ড জুড়িয়া প্রস্তুত হয়। মৌমাছিদের পায়ে চিরুণীর দাঁতের মত যে-সকল কাঁটা লাগানো আছে, ইহাদের পায়েও ঠিক তাহাই দেখা যায়। গায়ে, মাথায় বা শুঁয়োতে ধূলা মাটি বা অন্যান্য কোন আবর্জ্জনা লাগিলে, উহারা পায়ের চিরুণী দিয়া তাহা ঝাড়িয়া ফেলে। তোমরা যদি কিছুক্ষণ কোনও পিপীলিকার চলা-ফেরা লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, সে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া পা দিয়া শুঁয়ো ঘসিতেছে। শরীরের ময়লা মাটি ছাড়াইবার জন্যই উহারা ঐ-রকম করে। গোরু যেমন জিভ দিয়া বাছুরের গা চাটে ও গায়ের ময়লা ছাড়াইয়া দেয়, পিপীলিকারা সেই রকমে পরস্পরের গায়ে পা বা শুঁয়ো বুলাইয়া শরীরের ধূলা-মাটি পরিষ্কার করে।

পরপৃষ্ঠায় পিপীলিকার মুখের একটা বড় ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী মুখ! অন্য পতঙ্গের মুখ কতকটা ছুঁচলো, কিন্তু পিপীলিকার মুখ একবারে চেপ্‌টা এবং চোখ দু'টা

নিতান্ত ছোট। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এত ছোট চোখ লইয়া উহারা কি করিয়া চলা-ফেরা করে। মাটির তলায় অন্ধকারে পিপীলিকারা যখন ঘর-দুয়ার প্রস্তুত করে, তখন চোখের দরকারই হয় না, শুঁয়ো দিয়া সব জিনিষকে ছুঁইয়াই কাজ চালায়। চোখের দরকার হয় না বলিয়াই পিপীলিকাদের চোখ এত ছোট হইয়াছে।

পিপীলিকার মাথা।
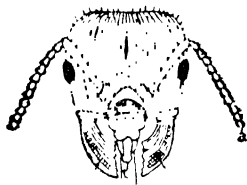
পিপীলিকার শুঁয়ো বড় আশ্চর্য্য জিনিষ। চোখ, নাক ও কাণ দিয়া আমরা যে-সব কাজ করি, সম্ভবতঃ উহারা শুঁয়ো দিয়াই সেই সকল কাজ চালায়। সুতরাং বলিতে হয়, পিপীলিকার চোখ, কাণ ও নাক এই তিন ইন্দ্রিয়ই শুঁয়োতে আছে। কোথাও এক কণা চিনি পড়িয়া থাকিতে দেখিলে পিপীলিকারা কি করে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। সে ছুটিয়া গিয়া বাসায় খবর দেয়। তার পরে দলে দলে পিপীলিকা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া মিষ্ট খাইয়া ফেলে বা তাহা বাসায় বহিয়া লইয়া যায়। পিপীলিকারা আমাদের মত কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, সম্ভবতঃ তাহারা শুঁয়ো নাড়িয়া দলের পিপীলিকাদের কাছে খবর দেয়। পথে চলিতে চলিতে দুইটি পিপীলিকা মুখোমুখি হইলে,

তাহারা দাঁড়াইয়া কি রকমে শুঁয়ো নাড়ানাড়ি করে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? সম্ভবতঃ এই রকমে শুঁয়ো নাড়িয়াই, তাহারা পরস্পর আলাপ করে এবং দলের পিপীলিকাদের চিনিয়া লয়।

পিপীলিকার মুখের চোয়াল দুইটি করাতের মত, কি-রকম ধারালো তোমরা হয় ত তাহা দেখিয়াছ। ডেয়ো-পিপীলিকারা এই রকম দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিলে রক্তপাত করিয়া দেয়। ছাড়াইতে গেলে প্রায়ই ইহাদের গলা ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু তবুও কামড় ছাড়ে না। মাটি কাটিয়া ঘর প্রস্তুতের সময়ে ইহারা ঐ দাঁত জোড়াটা খুব কাজে লাগায়। যখন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধে, তখন ইহারা ঐ দাঁত দিয়াই শত্রুকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাই পিপীলিকাদের আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র নয়। কোনও কোনও পিপীলিকাদের লেজের শেষে হুলও আছে। কাঠ-পিঁপড়ে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া শরীরটাকে বাঁকাইয়া ফেলে এবং ক্ষত স্থানে বিষযুক্ত হুল বসাইয়া দেয়। যে-সকল পিপীলিকার বুক ও লেজের জোড়ের জায়গায় দুইটা করিয়া বলের মত পিণ্ড থাকে প্রায়ই তাহাদের পিছনে হুল দেখা যায়। এই সকল পিপীলিকাই বিষাক্ত; ইহারা কামড়াইলে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা হয়।

দাঁত দিয়া আমরা খাবার চিবাইয়া খাই, কিন্তু পিপীলিকারা সম্মুখের ঐ দু'টা দাঁত দিয়া কখনই খাবার চিবায় না। চিবাইবার জন্য ভিতর দিকে এক জোড়া ছোট দাঁত আছে এবং জিভও আছে। মিষ্ট জিনিষ, ফল এবং ছোট পোকা-মাকড় পিপীলিকাদের প্রধান খাদ্য। খাদ্য কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবার সময়ে উহারা সেই সাঁড়াশির মত দাঁত জোড়াটা ব্যবহার করে ; কিন্তু খাদ্য মুখে দিবার পরে তাহারা ভিতরকার দাঁত ও জিভ ছাড়া আর কিছুরই ব্যবহার করে না।

অনেক পতঙ্গেরই ডানা থাকে, কিন্তু সকল পিপীলিকার ডানা হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী এবং পুরুষ, কেবল তাহাদেরই শরীরে ডানা দেখা যায়। কর্ম্মী পিপীলিকাদের ডানা নাই। তোমরা ঘরে বাহিরে যে-সব পিপীলিকাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখ, তাহাদের সকলেই কর্ম্মী। তাই ইহাদের ডানা নাই।

কর্ম্মী পিপীলিকাদের মধ্যে অনেক কাজের ভাগ আছে। কেহ বাসায় পাহারা দেয়, কেহ সৈনিকের কাজ করে, কেহ ঘর বানায়, কেহ বাহির হইতে খাবার জোগাড় করিয়া আনে, কেহ-বা শিশু সন্তানদিগকে লালনপালন করে। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে পিপীলিকার গাদার অসংখ্য পিপীলিকার মধ্যে কতকগুলির আকার বড় দেখিতে পাইবে,—ইহাদের

মাথাগুলো যেন শরীরের তুলনায় অনেক বড়। ইহারা সৈনিক পিপীলিকা। অন্য পিপীলিকার সঙ্গে যখন লড়াই বাধে তখন উহারা মস্ত মাথার ধারালো দাঁত দিয়া লড়াই করে। সাধারণ কর্ম্মীরাই ছোট আকারে জন্মে। স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকার আকার কিছু বড়, কিন্তু ইহারা প্রায়ই গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহিরে আসে না।

পিপীলিকারা কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তোমরা জান কি? এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা সর্ব্বভুক্। মাছ, মাংস, ফল-মূল, চাল-ডাল, ঘি, তেল, মিষ্টি, টক্ কিছুই ইহাদের অখাদ্য নহে। একবার একটা পুঁটি মাছ মাটিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পাঁচ মিনিটেই দলে দলে লাল পিপীলিকা আসিয়া মাছটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খাইয়া শেষ করিয়াছিল। মাছের কেবল কাঁটা কয়েকটি পড়িয়াছিল। ফড়িং বা অপর পোকা-মাকড় আধ-মরা হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিলে পিপীলিকার দল তাহা কি রকমে খাইয়া ফেলে দেখ নাই কি? কেবল নিজের খাওয়া নয়,—বাচ্চাদের এবং বাসায় থাকিয়া যাহারা কাজ করে তাহাদের খাওয়াইবার জন্যও ইহারা খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়।

মৌমাছিদের মত পিপীলিকাদেরও গলার নীচে থলি থাকে। নিজের পেট ভরিলে ইহারা খাদ্য চিবাইয়া

ঐ থলিতে ভরিয়া রাখে। তার পরে উহা উগ্‌লাইয়া বাচ্চাদের বা কর্ম্মীদের প্রয়োজন-অনুসারে খাইতে দেয়। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমাদের এক-এক সমাজে হয় ত আট-দশ হাজার লোক থাকে। ইহাদের মধ্যে ধনী ও গরীব দুই রকমেরই লোক দেখা যায়। কিন্তু ধনীরা সহজে গরীবদের সাহায্য করে না। তাহারা নিজের ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া সুখে থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পিপীলিকাদের মধ্যে এই ভাবটি একেবারে নাই। বহু কষ্টে কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া পিপীলিকারা যখন বাসার দিকে ছুটিয়া চলে, তখন পথের মাঝে যদি নিজের দলের কোনও পিপীলিকা শুঁয়ো নাড়িয়া খাবার চায়, তবে তাহারা তখনি গলার থলি হইতে খাবার উগ্‌লাইয়া ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকাকে খাওয়াইতে থাকে। এই রকম ব্যবস্থা আছে বলিয়াই পিপীলিকাদের সমাজের কাজ সুন্দরভাবে চলে। যাহারা খাবার সংগ্রহ করে, তাহারা সেই খাবার আবশ্যকমত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। যাহারা ঘর তৈয়ারি করে, তাহারা কেবল নিজের জন্য ঘর তৈয়ারি করে না, দলের সকলেই যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, সেই দিকে নজর রাখে। যাহারা সিপাহী বা পাহারাওয়ালার কাজ করে, তাহারা দলের প্রত্যেককে রক্ষা করিবার জন্য শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে। যাহাদের হাতে

সন্তানপালনের ভার আছে, তাহারা সব কাজ ফেলিয়া দিবারাত্রি বাসার মধ্যে থাকে এবং সর্ব্বদা ডিম ও বাচ্চাদের খোঁজ-খবর লয়। এমন সুব্যবস্থা এক মানুষের সমাজ ভিন্ন অন্য প্রাণীর সমাজে দেখা যায় না।

প্রশ্ন।

১। পিপীলিকারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করে?

২। পিপীলিকার মুখে যে শুঁয়ো লাগানো থাকে, তাহার ব্যবহার কি?

৩। পিপীলিকাদের মধ্যে যে শ্রেণী-বিভাগ আছে তাহার উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া পিপীলিকার শ্রেণী বিভাগ করা হয়? কর্ম্মী পিপীলিকার দেহের গঠন কি প্রকার?

৪। পিপীলিকারা যে প্রণালীতে তাহাদের ঘরের কাজ সম্পন্ন করে, তাহা বর্ণন কর।

ভূ-কম্পন।

পৃথিবীর উপরকার চারিভাগের তিন ভাগ সমুদ্র, বাকি এক-চতুর্থাংশের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ সকল ঋতুতেই তুষারে ঢাকা থাকে। সেখানে মানুষ সহজে যাইতে পারে না। তদ্‌ভিন্ন আফ্রিকা ও আমেরিকার অনেক স্থান জঙ্গলে আবৃত। সেখানেও মানুষের বসতি কম। এই নিমিত্ত হিসাব করিলে দেখা

যায় যে, ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের মধ্যে অতি-অল্পই মনুষ্যের আয়ত্ত। ভূগর্ভের অবস্থা আমাদের কতদূর জানা আছে তাহা আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, মাটির খুব নীচে কি আছে আমরা জানি না। পৃথিবীর গভীরতম খনির গভীরতা সাড়ে সাত হাজার ফিট্ অর্থাৎ দেড় মাইলের অধিক নহে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় চারি হাজার মাইল। সুতরাং চারি হাজার মাইলের মধ্যে কেবল দেড় মাইলের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। ভূগর্ভের সহিত আমাদের পরিচয় যে কত অল্প, ইহা হইতে বুঝা যায়। যাহা হউক পৃথিবীর ভিতরটা যে শীতল নয় তাহা অনেক পরীক্ষায় স্থির হইয়া আছে। পৃথিবী হঠাৎ কাঁপিয়া মধ্যে মধ্যে যে ভয়ানক অনিষ্ট করে, তাহা পৃথিবীর ভিতরকার তাপের দ্বারাই হয়। যে দেশে আগ্নেয় পর্ব্বত অধিক, সে দেশে ভূকম্পনও অধিক দেখা যায়। ইহা লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, আগ্নেয় পর্ব্বতের গভীর স্থানে যখন গলিত ধাতু ও জলীয় বাষ্পাদি জমিয়া আলোড়ন উপস্থিত করে তখন সেখানকার মাটিপাথর কাঁপিতে থাকে। তার পরে সেই কাঁপুনিই আমাদের নিকট ভূকম্পনরূপে প্রকাশ পায়। পুষ্করিণীর স্থির জলে ঢিল ফেলিলে জলের আলোড়ন যেমন ঢেউয়ের আকারে চারিদিকে

চলে, ভূগর্ভের আলোড়নও ঠিক সেই রকমেই ভূপৃষ্ঠের জলে স্থলে চলিতে থাকে। আকাশের বাতাসও তাহাতে কাঁপিতে আরম্ভ করে। ইহাতে মেঘ-গর্জ্জনের মত শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। বড় ভূকম্পনের সময় এই প্রকার শব্দ প্রায়ই শুনা যায়।

যে প্রদেশে আগ্নেয়গিরি নাই, অনেক সময়ে সেখানেও ভূমিকম্প হয়। এই শ্রেণীর কম্পনের অন্য হেতু আছে। পৃথিবীর ভিতরে সময়ে সময়ে নানা কারণে গহ্বর উৎপন্ন হয়। কোন স্থানে ঐরূপ কোন বড় গহ্বর উৎপন্ন হইলে, উপরের মাটিপাথর উহার উপরে চাপ দিতে আরম্ভ করে। এই চাপে এক এক সময়ে উপরকার মাটি ধসিয়া গর্ত্ত পূরণ করে। বৈজ্ঞানিকগণের মতে ভূগর্ভের গভীর প্রদেশের এই আলোড়নই চারিদিক কাঁপাইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি করে। গত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন আমাদের দেশে যে ভূমিকম্প উৎপন্ন হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসাম-অঞ্চলের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। কুচবিহার রাজ্য, উত্তর-বঙ্গ এবং ময়মনসিংহ জেলায় এই কম্পন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ঐ সকল স্থানের এবং কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নগরের যে কত বৃহৎ অট্টালিকা এই উৎপাতে ভূশায়ী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গদেশের ও আসামের অধিকাংশ

রেলপথ ও সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ভূকম্পনের প্রবলতায় অনেক স্থানের মাটি ফাটিয়া যাওয়ায় ভূগর্ভ হইতে জল বালুকা প্রভৃতি উঠিয়াছিল। এইপ্রকার প্রবল ভূমিকম্প বোধ হয় বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে এই ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া পাঁচ ছয় মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। গভীর রাত্রিতে এইপ্রকার ভূমিকম্প হইলে দেশের কত লোক যে অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপে যে এক মহাভূমিকম্প হয়, তাহাতে জলপ্লাবন দ্বারা সমুদ্রবর্ত্তী লিসবন নগরে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের ভূমিকম্পে সমুদ্রের ঢেউ প্রায় চল্লিশ হাত উচ্চ হইয়া সমুদ্রতীরের অনেক নগর প্রায় জনশূন্য করিয়াছিল। এই ভূমিকম্পে প্রায় কুড়ি হাজার লোক কয়েক মিনিটের মধ্যে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

ভূকম্পনের যেমন অপকারিতা আছে তেমনি উপকারিতাও আছে। নীচু এবং বাসের অযোগ্য দেশ ভূকম্পনে উঁচু হয়। এমন কি পণ্ডিতগণ বলেন, ভূকম্পনেই পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে। পর্ব্বত দ্বারা জগদবাসীদের যে উপকার হইতেছে, তাহা

বলিয়া শেষ করা যায় না। অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি পর্ব্বতেই হইয়া থাকে। ঐ নদী-সমূহ যে কেবল লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করে তাহা নয়, ভূমি সরস করিয়া তাহার উর্ব্বরতাও বাড়ায়। মেঘসমূহ পর্ব্বতে ঠেকিয়া শীতল হয় এবং বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে। ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ও অসীম শক্তির কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

প্রশ্ন।

১। ভূমিকম্প কি প্রকারে উৎপন্ন হয় নিজের ভাষায় বল।

২। ভূমিকম্পের যেমন অপকারিতা আছে, তেমনি উপকারিতাও আছে। উদাহরণ দিয়া ইহার তাৎপর্য্য বল।

৩। কয়েকটি বড় ভূমিকম্পের উল্লেখ কর। তুমি নিজে কখনও ভূমিকম্প অনুভব করিয়াছ কি?

৪। ভূগর্ভ, ভূপৃষ্ঠ,—শব্দের অর্থ কি? "ভূ" এই শব্দের সহিত অন্য শব্দ যোজনা করিয়া চারিটি নূতন শব্দ রচনা কর।

৫। উর্ব্বরতা, অবাক্, জলপ্লাবন, সর্ব্বনাশ,—এই শব্দগুলির অর্থ বল এবং এই শব্দগুলির এক একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

জোনাক পোকা।

জোনাক পোকা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। খুব শুক্নো জায়গায় ইহাদিগকে বেশি দেখা যায় না। বর্ষার শেষে জলা জায়গায় ইহারা এক-এক সময়ে

গাছপালায় এত বেশি জমা হয় যে, অন্ধকার রাত্রিতে দেখিলে মনে হয়, যেন গাছে আগুন লাগিয়াছে।

জোনাক পোকার চেহারা কি-রকম, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলে ভাল করিয়া দেখ নাই। রাত্রিতে একটা পোকা ধরিয়া গ্লাস্ বা বাটি চাপা দিয়া রাখিয়ো এবং প্রাতে তাহার চেহারাটা দেখিয়ো।

জোনাক পোকা নানা রকমের দেখা যায় এবং প্রত্যেক রকম পোকার গায়ের রঙ্ পৃথক্। হল্‌দে, বাদামী, লাল প্রভৃতি নানা রঙের জোনাক পোকা আছে। আকারেও এগুলির মধ্যে কেহ বড় এবং কেহ বা ছোট। আমরা যে-সব জোনাক পোকাকে বাগানের গাছে বা ঘরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম।

ইহাদের শরীর কতকটা লম্বা ধরণের। ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। গোব্‌রে পোকা প্রভৃতি পতঙ্গদের শরীর যেমন হাড়ের মত শক্ত, ইহাদের দেহ কিন্তু সে-রকম নয়: দেহের আবরণ কতকটা নরম। দিনের বেলায় জোনাক পোকারা লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে, আনন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। গাছের নরম

জোনাক পোকা।

পাতা, ডাল ইত্যাদিই অধিকাংশ জোনাক পোকার
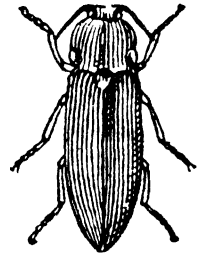
প্রধান খাদ্য। আবার ছোট পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, এমন জোনাক পোকাও আছে।

জোনাক পোকাদের আলো তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহা বাতির আলো, উনুনের আলো বা সূর্য্যের আলোর মত নয়। এই আলোতে যেন একটু নীল রঙ থাকে। আমরা বাতি জ্বালিয়া যে আলো পাই, তাহা কেবলই আলো নয়, উহার সঙ্গে তাপও মিশানো থাকে। সূর্য্যের আলো ও বিদ্যুতের আলোতেও তাপ থাকে। কিন্তু জোনাক পোকারা যে আলো দেয়, তাহা কেবলই আলো, তাহাতে একটুও তাপ মিশানো থাকে না। লেজের যে-অংশটা দপ্‌দপ্‌ করিয়া আলো দেয়, তোমরা নির্ভয়ে তাহাতে হাত দিয়া দেখিয়ো—একটুও গরম বোধ করিতে পারিবে না।

লাল দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে এক রকম জিনিষ মাখানো থাকে, তাহাকে ফস্‌ফরস্‌ বলে। ফস্‌ফরসের গায়ে বাতাস লাগিলেই উহা জ্বলিয়া উঠে। দেওয়ালের গায়ে লাল দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঘসিলে দেওয়াল কি-রকম উজ্জ্বল হয়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত তাহা দেখিয়াছ। জোনাক পোকার আলো কতকটা ফস্‌ফরসের আলোরই মত। তফাতের মধ্যে ফস্‌ফরসের আলোতে তাপ থাকে, জোনাকের আলোতে মোটেই তাপ থাকে না। অনেকে বলেন, জোনাক পোকার

গায়ে ফস্‌ফরস্‌ আছে, তাহাই আলো দেয়। কিন্তু এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। ফস্‌ফরসের সঙ্গে জোনাক পোকার আলোর একটুও সম্বন্ধ নাই। তাপ না জন্মাইয়া ইহারা কি রকমে ঠাণ্ডা আলো জন্মায় তাহা আজও ঠিক করা যায় নাই। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌পিণ্ডের উঠা-নামা যেমন তালে তালে চলে, জোনাক পোকার আলোও ঠিক সেই রকমে তালে তালে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, আমরা যেমন শরীরের শক্তি ক্ষয় করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ও চলা-ফেরার কাজ চালাই, জোনাক পোকারা ঠিক সেই রকমেই আলো উৎপন্ন করে। কিন্তু কোন্‌ প্রণালীতে দেহের শক্তি দিয়া আলো উৎপন্ন হয়, তাহা আজও জানা যায় নাই।

আমরা যখন কেরোসিন বা অন্য কোনও তেল পুড়াইয়া আলো উৎপন্ন করি, তখন তেলের সকল শক্তিই আলোর আকার পায় না ; ঐ শক্তির বেশির ভাগই অনাবশ্যক তাপ জন্মাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। জোনাক পোকারা কি-রকমে তাপ উৎপন্ন না করিয়া কেবলমাত্র আলো উৎপন্ন করে, তাহা জানা গেলে আমাদের অনেক লাভ হইবে। তখন আমরা ল্যাম্প হইতে কেবল তাপহীন আলো পাইব। কাজেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাপ জন্মিয়া এখন তেলের যে বাজে খরচ করে, তখন, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

জোনাক পোকা কেন শরীর হইতে আলো বাহির করে, তাহা লইয়া বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সকলে এ-সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। আগুনকে সকলেই ভয় করে। কেহ কেহ বলেন, আগুনের মত আলো বাহির করিয়া জোনাক পোকারা নিশাচর পাখী প্রভৃতি শত্রুদের ভয় দেখায়। শত্রুরা জোনাক পোকাকে আগুন মনে করিয়া কাছে ঘেঁসে না ; আবার কেহ কেহ বলেন, জোনাক পোকার আলো শিকার ধরিবার ফাঁদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আলো দেখিলেই ছোট পোকা-মাকড় তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসে। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া আলো জ্বালিলে, কত পোকা আলোর কাছে জড় হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি ? জোনাক পোকার আলো যখন আগুনের মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন ছোট পোকারা আগুন মনে করিয়া কাছে ছুটিয়া আসে ! জোনাক পোকারা এই সুযোগে গণ্ডায় গণ্ডায় ছোট পোকা ধরিয়া আহার করিয়া লয়। আবার এক দল লোক বলেন, এই সব কথার কোনটাই ঠিক্ নয়। দিনের বেলায় জোনাক পোকারা যে যেখানে পারে দূরে দূরে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিকালেই তাহারা এক সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পায়। তাই রাত্রি আসিলেই তাহারা শরীর

টমাস্ এডিসন্ ।

হইতে আলো বাহির করিয়া সঙ্গীদিগকে কাছে আসিবার জন্য সঙ্কেত করে।

যাহা হউক, জোনাক পোকা বড়ই অদ্ভুত পতঙ্গ, ইহাদের জীবনের কাজ ও চলা-ফেরা বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

প্রশ্ন।

১। জোনাক পোকার আলোতে তাপ আছে কি? সূর্য্যের ও বিদ্যুতের আলোতে তাপ আছে কি?

২। জোনাক পোকার পিছনে যে আলো থাকে তাহাতে উহার কি উপকার হয়?

৩। আলোর জন্য তেল পুড়াইলে, বাজে খরচ হয় কেন?

৪। সুযোগ, অদ্ভুত, তাপহীন,—এই শব্দগুলির অর্থ কি?

টমাস্ এডিসন্।

টমাস্ এডিসনের নাম বোধ করি তোমরা শুন নাই। ইনি আমেরিকার একজন বড় বৈজ্ঞানিক। আজকাল বড় বড় সহরে তোমরা যে বিদ্যুতের দীপ দেখিতে পাও, এডিসনই তাহা প্রথমে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল নিমেষ মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরে সংবাদ পাঠান হইতেছে, সেই যন্ত্রেরও তিনি অনেক উন্নতি করিয়াছেন। তোমরা অনেকেই হয়ত গ্রামোফোন যন্ত্র দেখিয়াছ এবং তাহাতে

গান শুনিয়াছ। এই আশ্চর্য্য যন্ত্র এডিসনই প্রথম নির্ম্মাণ করেন। আজও তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় নব্বুই বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নানা যন্ত্র নির্ম্মাণের কাজ করিতেছেন।
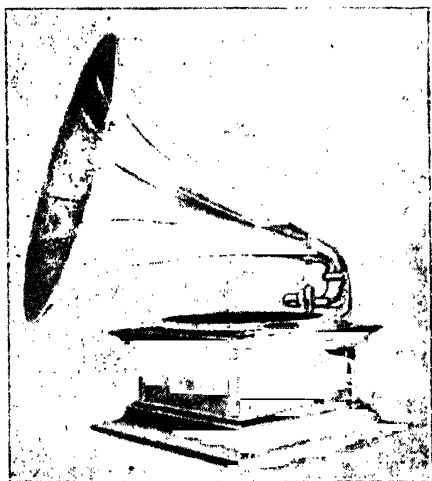
গ্রামোফোন্ যন্ত্র।

এডিসনের বাল্যজীবন বড় আশ্চর্য্যজনক। আমেরিকার ওহিয়ো প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা অতিদরিদ্র ছিলেন। পুত্র লাভ করিয়া তাঁহারা সুখী হইতে পারেন নাই। লেখাপড়ায় এডিসনের একটুও অনুরাগ ছিল না; তিনি দিবারাত্রি অশিষ্টতা করিয়া বেড়াইতেন।

তাঁহাদের কুটীরের নিকটে একটি খাল ছিল; এই খালের জলে সাঁতার দেওয়া এবং নিরীহ প্রতিবেশীদিগের বাটীতে উপদ্রব করা, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। এক দিন খালের জলে সাঁতার দিতে গিয়া তিনি প্রায় জলমগ্ন হইয়াছিলেন, কোন পথিক উদ্ধার না করিলে, এই সময়েই তাঁহার মৃত্যু ঘটিত। পিতার গোলা-বাড়ীতে গম, যব ইত্যাদি শস্য জড় করা থাকিত। একদিন আগুন লইয়া খেলিতে গিয়া তিনি শস্যের গাদায় আগুন লাগাইয়াছিলেন। এই রকম নানা অপরাধের জন্য জনক জননী এবং প্রতিবেশীরা তাঁহাকে প্রায়ই তিরস্কার করিতেন। একদা কোন গুরুতর অপরাধের জন্য গ্রামের বালকেরা মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও এডিসনের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এত অশিষ্টতা ও চপলতার মধ্যেও বালক এডিসনের একটা বিশেষ গুণ দেখা যাইত। কোন প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিলেই, তিনি মনোযোগ দিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং যাঁহারা বয়সে বড় তাঁহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেন। এডিসন্ তাঁহাদের গোলা-বাড়ীর একটি ঘরে কতকগুলি বোতল ও শিশি রাখিয়া দিতেন এবং তাহাতে নানা লতাপাতার রস রাখিয়া পরীক্ষা করিতেন। ইহাতে

নানা বস্তুর গুণের সহিত যে পরিচয় হইত, তাহা হইতে তিনি অনেক শিক্ষা পাইতেন।

শিশি বোতল লইয়া এডিসনের আর অধিক কাল পরীক্ষা করা হইল না। বয়স বেশী হইতেছে দেখিয়া পিতা তাঁহাকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি মন দিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া পিতা তাঁহাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শেষে নিকটবর্ত্তী এক রেলওয়েতে খবরের কাগজ বিক্রয় করার কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। এডিঁসন আনন্দের সঙ্গে এই নূতন কাজ করিতে লাগিলেন। রেলের কর্ত্তারা রেলগাড়ির একটি ছোট কাম্‌রায় তাঁহার বাসস্থান ঠিক্ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সেই সময়ে তিনি নিজের কামরায় বসিয়া লেখাপড়া করিতেন এবং একটি ছোট মুদ্রাযন্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিজের হাতে একখানি সংবাদপত্র গাড়িতেই ছাপাইতেন। রেলের আরোহীদিগের নিকটে এই সংবাদপত্রের বিশেষ আদর ছিল।

কিন্তু তখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার উৎসাহ এডিসনের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। সংবাদপত্র ছাপাইয়া ও বিক্রয় করিয়া তাঁহার অল্পই অবকাশ থাকিত। এই অবকাশে তিনি গাড়িতে বসিয়াই নানা

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতেও হইয়াছিল। একদা পরীক্ষা করার সময়ে একটি দ্রাবকের শিশি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গাড়িতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। গার্ড গাড়ি থামাইয়া আগুন নিভাইল বটে, কিন্তু সে এডিসনের কর্ণমূলে এমন ঘুঁসি মারিল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে হতচেতন হইয়া থাকিতে হইল। এই প্রকারে অবমানিত হইয়াও এডিসন্ মুক্তি পাইলেন না; রেলওয়ের কর্ত্তারা অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আর সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে দিলেন না। এডিসন্ মহা বিপদে পড়িলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, একটি সামান্য ঘটনায় এডিসনের ভাগ্য ফিরিয়া গেল। একদিন কোন ষ্টেশনের নিকটে দাঁড়াইয়া তিনি কোন রেল-কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। কর্ম্মচারীর শিশু পুত্রটি তখন রেলপথের উপরে খেলা করিতেছিল। সেই সময়ে যে একখানি গাড়ি ভীষণ বেগে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিল, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। যখন গাড়িখানি নিকটবর্ত্তী হইয়া শিশুটিকে দলিত করিবার উপক্রম করিল, তখন সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। শিশুর পিতা হতবুদ্ধি হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে রেল-লাইন হইতে

শিশুকে উঠাইয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর গ্রাস হইতে পুত্র মুক্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া রেল-কর্ম্মচারী এডিসন্‌কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং রেলের টেলিগ্রাফ্‌-বিভাগে তাঁহাকে একটি সামান্য পদে নিযুক্ত করিলেন। এই পদ-লাভই এডিসনের উন্নতির সোপান হইল। যে নূতন নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তিনি আজ বিখ্যাত হইয়াছেন, টেলিগ্রাফে কাজ করিবার সময়ে একে একে সেগুলির কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন।

১। এডিসনের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ কর এবং বাল্যে তিনি কি রকম বালক ছিলেন তাহা বল।

২। অশিষ্টতা, চপলতা, অনুরাগ, প্রাকৃতিক, যাদুকর, কৃষিকার্য্য, উপক্রম,—এই শব্দগুলির সরল অর্থ বল।

৩। এডিসন্ কোন্ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের নিকটে বিখ্যাত হইয়াছেন?

৪। "যাহা বলা যায় না," "যাহা বর্ণনা করা যায় না," "যাহার তিনটি লোচন আছে," "গরুর দুগ্ধ" "যুদ্ধে যিনি স্থির," "যাহার মান আছে,"—এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটির অর্থ এক একটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত কর।

৫। কর্ত্তৃকারকে কোন্ কোন্ বিভক্তি থাকে? প্রত্যেকের এক একটি উদাহরণ দাও।

৬। বিজন—বীজন, দ্বিপ—দ্বীপ, শীত—সিত, এই যুগ্মশব্দ-গুলির প্রত্যেকের অর্থ বল।

পদ্যাংশ

প্রার্থনা।

জয় ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্,
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ,
তোমাতেই থাকে মতি।

অখিল সংসার, রচনা তোমার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।
সদা অপরূপ, হেরি তব রূপ,
বিমোহিত হ'য়ে থাকি।

আকাশ সাগর, গহন নগর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে,
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে।

পৃথিবী সলিল, অনল অনিল,
রবি শশী আর তারা,
নিয়ম তোমার করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তা'রা।

কুসুম-কেশরে, ভ্রমর বিহরে,
সুখে করে মধু পান।
নানা রাগ ভরে, গুণ্ গুণ্ স্বরে,
করে তব গুণগান।

কোঁকিল-কলাপ, মধুর আলাপ,
করিছে, ধরিছে তান!
শুনে যায় ক্ষুধা, তাহাতে কি সুধা
ক্ষরিছে, হরিছে প্রাণ।

যতেক খেচর, লয়ে সহচর,
সহচরী সহ চরি।
বসি তরু'পরে, কলরব করে,
মরি মরি আহা মরি!

কভু বনে চরে, কখন নগরে,
চরাচরে করে খেলা।
নিজ নিজ ঝাঁকে, পাখী থাকে থাকে
করিতেছে যেন মেলা।

উদর ভরিয়া, আহার করিয়া,
প্রীত হ'য়ে গীত ধরে।
কি কহিব আর, সে গানে তোমার,
মহিমা প্রচার করে।

শাখি-শাখা যত, ফলভরে নত,
চরণে প্রণত তা'রা।
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে,
দর দর প্রেমধারা।

ওহে ভব-ধব, কি করিব স্তব,
মানস-তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া, শুদ্ধ মতি দিয়া,
আমারে কৃতার্থ কর।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

প্রশ্ন।

১। অখিল, গহন, সলিল, কেশর, কলাপ, খেচর, চরাচর, পল্লব,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

২। ভব-ধব, মানস-তিমির,—এই দুইটির সমাস-বাক্য এবং অর্থ বল।

৩। কবি প্রকৃতিতে যে-সকল ঈশ্বর-মহিমা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় বল।

পরম বন্ধু।

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল-নিকর ;
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর।
গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে যত মধুকরে,
কেমনে পুলকে তায় মধুপান করে।
কিন্তু এরা হারাইবে এ দিন যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন ?
আশায় বঞ্চিত হ'লে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার।
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় ! কেহ কারো নয়,
কেবল ঈশ্বর, এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।

প্রশ্ন।

১। ঈশ্বরকে আমাদের পরম বন্ধু বলা হইল কেন ?

২। মধুকর, বিশ্বপতি,—এই শব্দ দুইটিকে বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের অর্থ বল।

৩। মধুকরকে পদ্মের প্রকৃত বন্ধু বলা হইল না কেন ?

৪। পুলক, কমল-নিকর, মনোহর,—এই শব্দগুলির অর্থ বল এবং "মনোহর" এই শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

উদ্যমশীলতা।

কি কারণ, ভীরু, তব মলিন বদন।
যতন করহ, লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

প্রশ্ন।

১। "উদ্যমশীলতার" অর্থ কি?

২। মহী, পান্থ,—এই দুইটি শব্দের অর্থ বল।

৩। দুঃখ বিনা যে সুখ লাভ করা যায় না, তাহার দুইটি উদাহরণ দাও।

৪। "ভীরু," "পুরে,"—এই দুইটি পদের অন্বয় কর।

স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ।

কৈলাস-শিখর মধ্যে যত ধাতু ছিল,
তার মধ্যে লৌহ আসি স্বর্ণকে নিন্দিল,—
"নির্গুণ হইয়া কর রূপের গৌরব,
সিমূলের ফুল যেন বিহীন সৌরভ!

নির্গুণ হইয়া যেবা বাঁচে পৃথিবীতে,
উচিত না হয় তার মুখ দেখাইতে।”

অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়,
সাপের মাথায় যেন ভেকে প্রহারয়!
স্বর্ণ বলে, “লৌহ! তুমি হীনবর্ণ হও,
আমার সঙ্গেতে যুঝ সমতুল নও।
ত্রিভুবন মধ্যে আমি উত্তম ভূষণ,
উত্তম বলিয়ে সবে করে আকিঞ্চন।
তোমাতে আমাতে চল সভামধ্যে যাই,
কাহারে আদর করে বুঝিব বড়াই!”
এ কথা শুনিয়া লৌহ ক্রোধে উঠে জ্ব’লে,
আপন গৌরব করি স্বর্ণে কিছু বলে,—
“আমি যাই ক’রে দিই তোমার নির্ম্মাণ,
তাই সে সকলে করে তোমার সম্মান।
দেউল জাঙাল আদি দীঘি সরোবর,
আমি সে খনন করি পর্ব্বত-শিখর;
অরণ্য কাটিয়ে আমি নগর বসাই,
দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী সাজাই;
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্বলোকে খায়,
আমা হ’তে সর্ব্বলোকে ভয়ে ত্রাণ পায়;
আমি যাই ক’রে দিই লেখনী নির্ম্মিত,
তবে হয় মানুষের পুস্তক লিখিত।

আমা ছাড়া কোন্ কর্ম্ম আছে পৃথিবীতে ?
বিবেচনা ক'রে বুঝ প্রভেদ তোমাতে !
সভামধ্যে যেতে বল, কোথা যাবে চল,
সহজে দুর্ব্বল তুমি সোহাগাতে গল।
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা যদি থাকিত তোমার,
তা হ'লে নখরে ক্ষিতি করিতে বিদার।"

এ কথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্তলোচন,
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেন লোহিতবরণ।
স্বর্ণ বলে, "কাল-দোষে সব হৈল হত,
নীচ হৈল উচ্চগামী, উচ্চ হৈল নত।
যাহারে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্ব-পদতলে,
সেই ব্যক্তি কটু উক্তি আমারে যে বলে !
তোমাতে আমাতে দূর সহস্র যোজন,
নৃপতি-মস্তকে আমি মুকুটভূষণ।
কামিনী-শরীরে আমি নানা অলঙ্কার,
যতনে রাখিছে মোরে গলে করি হার ;
মণিমুক্তা প্রবালাদি যত রত্ন আছে,
আমাতে জড়িত হ'য়ে উজ্জ্বল হ'য়েছে।
লৌহ ছাড়া কোন কর্ম্ম নাই পৃথিবীতে,
এখনি কহিলি তুই আমার সাক্ষাতে,—
সত্য বটে সিঁদ কাট তস্করের করে,
গো-হত্যার হেতু আছ কসায়ের ঘরে,

চর্ম্মকার-গৃহে আছ নানা অস্ত্র হ'য়ে,
জীব-হিংসা হেতু আছ পৃথিবী ব্যাপিয়ে !
হিংসকের দুরবস্থা পদে পদে হয়,
বেহায়া হিংসক তবু হিংসা না ছাড়য়।
হিংসা পাপ অতি মন্দ কভু নহে ভাল,
হিংসার কারণে তোর বর্ণ হ'ল কাল ;
হিংসার কারণে তোর অল্প মূল্য হ'ল,
ধাতু মধ্যে তোরে অতি জঘন্য করিল।"
স্বর্ণের বচনে লৌহ জ্বলিয়া উঠিল :
মূর্ত্তিমান অগ্নি-প্রায় বলিতে লাগিল,—
"রতি মাষা যবে যার হয় পরিমাণ,
সেই ব্যক্তি হ'তে চায় আমার সমান ?
আপন ওজন লোকে বুঝে যদি চলে,
উত্তম বলিয়া তবে সকলেতে বলে।
স্বর্ণ বিনা সংসারের কিবা আসে যায় ?
লৌহ না থাকিলে লোক কত দুঃখ পায়।
পথে যেতে তুমি স্বর্ণ সঙ্গে থাক যার,
রক্ষা কি করিবে তার প্রাণে বাঁচা ভার !
আমারে লইয়া যাক্ লিখে দিতে পারি,
যদি তার বিঘ্ন হয় বৃথা নাম ধরি।
অনর্থক হিংসা তরে না ধরি জীবন,
সাক্ষী তার আছয়ে ভারত রামায়ণ।

রামপ্রিয়া সীতা হরেছিল দশানন,
আমা হৈতে হৈল পাপী সবংশে নিধন।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে করি পরাজয় রণে,
যুধিষ্ঠিরে বসালাম রাজ-সিংহাসনে।
দুষ্টের দমন আর মহতের হিত—
এই মোর কুল ধর্ম্ম জগতে বিদিত।
আপন গৌরব করা উপযুক্ত নয়,
কোকিল যে কাল তা'তে কিবা আসে যায়?"

৺রামসুন্দর ঘটক।

প্রশ্ন।

১। স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদের বিবরণ নিজের ভাষায় বল। এই বিবাদে কে জয়ী হইল?

২। কুলধর্ম্ম, সুবংশ, মূর্ত্তিমান্, আরক্তলোচন, ক্ষিতি, চমৎকার,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

৩। মুকুটভূষণ, দুরবস্থা, যুধিষ্ঠির, অশ্বপদতল, হীনবর্ণ,—এই সমস্ত-পদগুলির সমাস-বাক্য লিখ এবং প্রত্যেক পদের অর্থ বল।

৪। নিন্দিল, প্রহারয়,—এই দুইটি শব্দকে গদ্যে ব্যবহার করা যায় কি? গদ্যে ব্যবহার করিলে তাহাদের কি-প্রকার রূপ হইবে?

পলাশীর যুদ্ধ।

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

নাচিল সৈনিক রক্ত ধমনী-ভিতরে,
মাতৃ-কোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীম রবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধ'রে
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'লো রণস্থল।

অকস্মাৎ একবারে শতেক কামান,
করিল অনল বৃষ্টি,
ভীষণ সংহার-দৃষ্টি !
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'লো তিরোধান।

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইভ নির্ভয়-মন
করি রশ্মি-আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে দেখিতে সেনায়।

"সম্মুখে—সম্মুখে !" বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ-ধার :
ব্রিটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল অকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

পাখিগণ কলরব করি ব্যস্ত মনে,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল সঘনে।

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি !
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিশ বাজন।

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল সে ভীম রব ফাটিল গগন।

সেই ভীম রবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে লাগিল ঝঞ্চনা !

খেলিছে বিদ্যুৎ এ কি ধাঁধিয়া নয়ন !
লাখে লাখে তরবার
ঘুরিতেছে অনিবার
রবি-করে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম বরণ ;
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মিরমদন পতন।

"হুর্‌রো হুর্‌রো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ ;
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

৺নবীনচন্দ্র সেন।

প্রশ্ন।

১। "ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি" ইহার অর্থ কি ?

২। "দশ দিশি" অর্থ কি? দশটি দিকের প্রত্যেকটির নাম বল।

৩। এই কবিতায় যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহা নিজের ভাষায় বল।

৪। উগরিল, রড়ে, গণি,—এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করিয়া গদ্যে এক একটি বাক্য রচনা কর।

৫। অনিবার, সুপ্তোত্থিত, শার্দ্দূল, রশ্মি, অংস, দিগঙ্গন, অম্বর,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

বাহ্য বেশ বৃথা।

ইচ্ছা হয় রাজ-বস্ত্র পরিধান কর,
কিংবা শার্দ্দূলের চর্ম্মে ঢাক কলেবর;
ইচ্ছা হয়, কর ভস্ম-বিভূতি ভূষণ,
কিংবা কর সর্ব্বদেহে চন্দন লেপন।
কিন্তু ভ্রাতঃ! এই কথা মনে যেন রয়,
ভিতরে সাধুতা, বাহ্য বেশে কিছু নয়।
দমন করিতে যেবা পারে রিপুদল,
সেই সাধু,—তুচ্ছ কথা বেশের বদল।

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

প্রশ্ন।

১। শার্দ্দূল, বিভূতি, রিপু,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

২। রাজ-বস্ত্র, ভস্ম-বিভূতি,—ইহাদের সমাস ও সমাস-বাক্য বল।

প্রকৃত সাধু কে? সাধুর পক্ষে "তুচ্ছ কথা বেশের বদল" এইরূপ বলা হইল কেন?

সুজন ও কুজন।

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমলনিকর॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল॥
অতি রমণীয় কার্য্যে, পিশুন যে জন।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ॥
যথা অতি রমণীয় চারু কলেবরে।
ব্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকানিকরে॥

প্রশ্ন।

১। "অচল সচল"—ইহার অর্থ কি?

২। দুষ্ট লোকের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা নিজের ভাষায় বল।

৩। দিনকর, কমলনিকর, চারু, শিখরাগ্র,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।

ছুটি।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারায়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি'।

কেয়া পাতায় নৌকা গড়ে'
সাজিয়ে দেবো ফুলে,
তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দেবো
চল্‌বে দুলে দুলে।

রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখ্‌ব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বন লুটি' :
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন।

১। "টুটি", "ধেনু", বেণু", রেণু"—এইগুলির অর্থ বল।

২। ছুটির দিনে ছেলেরা কোন্ কোন্ আমোদ করিবে বলিয়া কবিতায় লেখা হইয়াছে ?

৩। "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে"—ইহার অর্থ কি ?